এপ্রিল-জুন ২০২২

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪০তম সংখ্যা

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা

নিরীক্ষা

২৪০তম সংখ্যা: এপ্রিল-জুন ২০২২

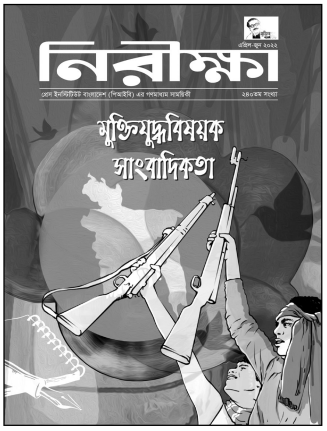

স্বপ্নপূরণের নতুন যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। অযাচিত সমালোচনা আর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খরস্রোতা পদ্মায় আজ দৃশ্যমান স্বপ্নের পদ্মা সেতু। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৫ জুন উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে সেই ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছেন তিনি। প্রমত্তা পদ্মার বুকে এই অসম্ভব স্বপ্ন সম্ভবে পরিণত করার স্বপ্নদ্রষ্টা ও কারিকর শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের আইকন, বাঙালি জাতির অহংকার, মর্যাদা ও সক্ষমতার প্রতীক। যুক্তরাষ্ট্রের যেমন স্ট্যাচু অব লিবার্টি, যুক্তরাজ্যের বিগ বেন, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, ব্রাজিলের ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার; তেমনই পদ্মা সেতু বিশ্ববাসীর কাছে অপার বিস্ময়। পদ্মা সেতু শুধু ইট-বালু-সিমেন্ট-রড-কংক্রিট-ইস্পাতের সুবিশাল স্থাপনাই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লাখো-কোটি বাঙালির ভালোবাসা, শ্রম-ঘাম ও আবেগমথিত স্বপ্ন। এই স্বপ্নের রূপকার জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা। অভিনন্দন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের। কিন্তু জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ভূখণ্ডের অস্তিত্বের পরিচয় যাঁর হাত ধরে, তিনি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বেই পাকিস্তানের অপশাসনের বিরুদ্ধে ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ফসল বাঙালির স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর জীবনপণ নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের সহাবস্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার সুফল বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি পাকিস্তানি আদলে দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনায় দায়িত্ব নেন। তিনি বাংলাদেশকে স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসাবে বিশ্বে পরিচিতি এনে দেন। মাঝখানে ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত আবারও ক্ষমতায় এসে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিকে ক্ষমতার অংশীদারত্ব দেয়। আবার শুরু হয় সেই ইতিহাসবিভ্রাটের যুগ। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর থেকে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে চলছে। আজ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান বাঙালির চেতনায় জাগ্রত। বাস্তবতা হচ্ছে, সামরিক জান্তা সরকারের সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নানাভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভ্রান্ত ও দিগ্‌ভ্রষ্ট করার দৃষ্টান্তও রয়েছে। নানা সময়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা হয়েছে সরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়ে। কিন্তু তা এখনো পর্যাপ্ত বলা যাবে না। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র' (১৫ খণ্ড) একটি বড়ো কাজ হলেও এখনো মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। নানা সময়ে রাজাকারদের তালিকা তৈরির দাবি তোলা হলেও এখনো সেটা ধোঁয়াশা। এখনো সাইকোলজিক্যাল ওয়ার, শরণার্থী, সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। এখনো ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয়নি। সুরাহা হয়নি বাংলাদেশের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া, রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে দুঃখপ্রকাশ করা কিংবা পাকিস্তানি নাগরিক বিহারিদের এদেশ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জাগ্রত রাখায় এটি জরুরি বলে আমরা মনে করি।

প্রকৃতির নিয়মেই মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কমে আসছে, অনেক স্থানে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন ও স্মৃতি স্থাপনা বিলীন হয়েছে, হচ্ছে। কোনো জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ তার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে ধরে রাখা, তুলে ধরা প্রত্যেক নাগরিকের দায়। এমন অবস্থায় নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের এ বিষয়ে তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট-ফিচার লেখার অনুষঙ্গ কী হবে, এর একটি গাইডলাইন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব প্রয়াস সামনে রেখে এবারের পিআইবি গণমাধ্যম সাময়িকী 'নিরীক্ষা'য় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার বিষয়ে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের মতামত আলোকপাত করা হয়েছে। সংখ্যাটি প্রকাশে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক ও প্রবীণ সাংবাদিক মোস্তফা হোসেইন লেখা সংগ্রহ এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন। তার প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সংখ্যাটি লেখক, সাংবাদিক ও গবেষকদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জানা এবং লেখালেখির আগ্রহের সহায়ক হবে বলে ধারণা করি।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

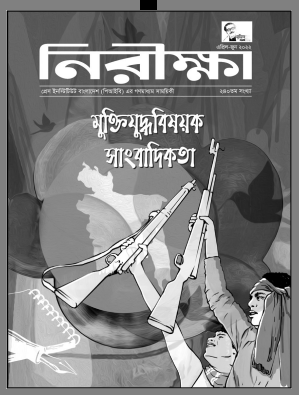

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা ৩
ড. মো. গোলাম রহমান

মুক্তিযুদ্ধই সাংবাদিকদের বড়ো আকর্ষণ ৬
অজয় দাশগুপ্ত

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা তথ্য সংগ্রহের নানা দিক ১৩
মোস্তফা হোসেইন

মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা ২১
নাদীম কাদির

স্বাধীনতাযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা ২৩
ফরহাদ মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা ভেতরে-বাইরে ২৫
সালাম জুবায়ের

আজকের দিনে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা ২৯
আলী হাবিব

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সাংবাদিকের দায় ৩১
ড. হারুন রশীদ

যুদ্ধ বা সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতা প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা ৩৪
মো. মিনহাজ উদ্দীন

৩৭ মার্চ '৭১: বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
শুভ কর্মকার

৪১ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা
রীতা ভৌমিক

৪৪ মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিকের সংবাদ দর্শন আমাদের চাই
পলাশ আহসান

৪৬ মুক্তিযুদ্ধের সংবাদে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির উপায়
মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান

৫১ যুগযুগান্তরের মহিরুহের উপাখ্যান
দুলাল আচার্য

৫৪ স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

৫৯ বিরূপতার বিপরীতে সপ্রতীপ পদ্মা সেতু
জাফর ওয়াজেদ

৬৫ গণমাধ্যম সংবাদ

৭৫ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা

ড. মো. গোলাম রহমান

দেশে আন্দোলন চলছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়টা ছিল বাংলাদেশের জন্য বিক্ষুব্ধময়। গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জাতীয় সংসদে বসতে পারছে না, শাসনভার গ্রহণ করতে পারছে না–নির্বাচনের ফলাফলের কোনো মূল্যই যেন পাকিস্তানের শাসকদের কাছে নেই। সেই সময়কার পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করবে, এটা সহজ হিসাব। অর্জিত অধিকার কার্যকর করা যে কোনো নাগরিকের জন্য অবশ্যকর্তব্য। সেই সময় পাকিস্তানের মিলিটারি শাসক ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করে। সময়ক্ষেপণ করছিল।

দেশের আপামরসাধারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে বিনা দ্বিধায় বাংলার একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন, তখন থেকে জনগণ এই এক দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল। সেই সময়টায় পুরো জাতি সংবাদপত্রের ওপর নজর রাখত। সংবাদপত্রের সার্কুলেশন সীমিত থাকলেও সেই সময়কার খবরগুলো জনে জনে জানাজানি হতো। চায়ের স্টল, কিংবা ছোটো ছোটো জমায়েতে সেই খবরগুলো পড়া হতো। আলোচনা হতো আর মানুষ অপেক্ষায় থাকত পরবর্তী নির্দেশ কী আসছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই আন্দোলনে জনমানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

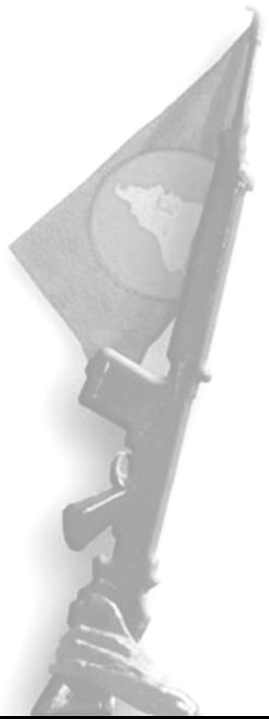

সেসময় পত্রপত্রিকাগুলো নিজেদের মতো করে লিখতে পারত। খবরের পাশাপাশি মতাশ্রয়ী লেখাগুলো বেশির ভাগ ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বাংলার মানুষের শোষণ-বঞ্চনার বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা।

২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত প্রায় সব পত্রিকা (পয়গাম ও সংগ্রাম বাদে) জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের পক্ষে আবেগাপ্লুত হয়ে সংবাদ ও লেখালেখি প্রকাশ করছিল। সেসময় সংবাদপত্রগুলো জাতির কাছে স্বেচ্ছায় তাদের দায়বদ্ধতা প্রকাশ ও প্রমাণ করেছে। সংবাদপত্রের ভাষাও ছিল তখন রক্ত গরম করা আবেগি এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। জনগণ যেমন তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ভুলে গিয়ে মানবতার পক্ষে সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই সাংবাদিকরাও নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এক হয়ে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কতিপয় জামায়াতপন্থি লোকজন হয়তো মানবতার এই আন্দোলনে এক হতে পারেনি।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ৮ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক নির্বাচনের ওপর কয়েকটি সংবাদের শিরোনাম করল: ‘ঐ নূতনের কেতন ওড়ে-/ দেশের

রাজনৈতিক অঙ্গনে সুরয-সম্ভাবনার সুস্পষ্ট আভাস'। আরেকটি শিরোনাম: 'নির্বাচনী ফলাফল- /স্বাধিকারের সপক্ষে বঞ্চিত বাংলার জনগণের দ্ব্যর্থহীন রায়'। ১০ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক আট কলাম দুই লাইন শিরোনাম করল, "বাঙলার নির্বাচনী রায় বাস্তবায়নে আগাইয়া আসুন/ পশ্চিম পাকিস্তানের 'সদ্যজাগ্রত জনগণের' প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান"। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ডিসেম্বর ইত্তেফাক ব্যানার শিরোনাম করল: 'বিরোধী শূণ্য প্রাদেশিক পরিষদ?/ একচেটিয়া বিজয়ের পথে আওয়ামীলীগ'। ১৯ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের ব্যানার শিরোনাম: 'সংগ্রামী বাংলায় বিস্ময়কর ইতিহাস"/ শোল্ডার দেওয়া হয়েছিল 'দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পন্নঃ আওয়ামীলীগের একক বিজয়'। ২৮ জানুয়ারি ইত্তেফাকের সাত কলাম শিরোনাম: 'রুদ্ধদ্বার কক্ষে মুজিব-ভুট্টো আলোচনা শুরু'। ১৬ ফেব্রুয়ারি ইত্তেফাক লিখল: 'আগুন লইয়া খেলিবেন না/ গণতন্ত্র নস্যাৎকামীদের প্রতি আওয়ামীলীগ-প্রধানের কঠোর হুঁশিয়ারি'। এদিকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ইত্তেফাক চার কলাম শিরোনাম লিখল: 'কেন্দ্রে শেখ মুজিব ও প্রদেশে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী নেতা নির্বাচিত'। একই তারিখে আরেকটি তিন কলাম শিরোনাম, 'ভুট্টোর হুমকি পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ঘটনা'। এসব সংবাদ থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর সহজভাবে হচ্ছে না। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এ আট কলামব্যাপী শিরোনাম ছাপা হলো 'উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের আহ্বান/ দেশবাসী রুখিয়া দাঁড়াও'। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি তখন খুবই স্পর্শকাতর। প্রতিটি কথাই তখন বারুদের মতো জ্বলে ওঠার মতো। এদিকে ভুট্টো বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তান অরক্ষিত রাখিয়া ঢাকায় যাই কেমনে? তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, 'আওয়ামীলীগ আদান-প্রদান ও বিনিময়ের মনোভাব প্রদর্শন না করিলে তাঁহার দল ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করিবে না।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। জনগণের আকুল প্রতীক্ষার প্রতি কোনো সংবেদনশীলতা না দেখিয়ে প্রস্তাবিত ৩ মার্চের 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত' (ব্যানার) ঘোষণা করা হলো। শেখ মুজিব তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, 'শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সেন্টিমেন্টের জন্য পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং আমরা উহা নীরবে সহ্য করিতে পারি না। ইহার দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। পরিষদ অধিবেশনের জন্য বাংলাদেশের সকল সদস্যই ঢাকায় ছিলেন। জনাব ভুট্টো এবং জনাব কাইয়ুম খানের দল ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী সকল সদস্যই অধিবেশনে যোগ দিতে রাজী ছিলেন।' অতঃপর সেদিন ঢাকায় এবং পরদিন প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। উত্তাল মার্চে সারা দেশ গর্জে ওঠে। সেদিন ঢাকায় হরতাল, রাতে কারফিউ ভঙ্গ এবং ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রদেশে হরতালের ঘোষণা আসে। শেখ মুজিব শান্তিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইত্তেফাক ব্যানার শিরোনাম করে, 'বিক্ষুব্ধ নগরীর ভয়াল গর্জন' (৩ মার্চ ১৯৭১)। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে ঘোষিত কর্মসূচি পালনের দ্বিতীয় দিনে পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা সমর্পণ করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত কর-খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি সেই সভায় বলেন, 'বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য–গুলী খাওয়ার জন্য নয়।' ৫ মার্চ ১৯৭১ ইত্তেফাক ব্যানার করে, 'জয় বাংলার জয়'।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ শেখ মুজিব বললেন, পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি (ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়, (খ) সমস্ত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়া হয়, (গ) নিরস্ত্র গণহত্যার তদন্ত করা হয় এবং (ঘ) নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। ইত্তেফাক শেখ মুজিবের কথা উল্লেখ করে চার কলাম শিরোনাম করে, 'আজ থেকে আমার নির্দেশ–'। সেই সংবাদে শেখ মুজিবের ১০ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়: 'বাংলার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ; সরকারী, আধা সরকারী অফিস, সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট ও আন্যান্য কোর্টে হরতাল; রিকশা, বেবি, বাস-ট্যাক্সি এবং রেলগাড়ি ও বন্দরসমূহ চালু রাখা; বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসেবীরা আমাদের বিবৃতি-বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিবেন এবং গণ-আন্দোলনের কোন খবর গায়েব করিবেন না, যদি বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঙ্গালীরা কাজে যোগ দিবেন না; শুধু লোকাল এবং আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক-টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন; স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখুন; গৃহশীর্ষে কালো পতাকা উড্ডীন রাখুন; ব্যাংকসমূহ প্রতিদিন দুই ঘণ্টা চালু রাখুন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও যেন পাচার না হয়; অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ থেকে হরতাল প্রত্যাহৃত হলো; স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন। এই আহ্বানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সর্বস্তরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠে এবং মুক্তিযুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।'

নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের আপামরসাধারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। তখন থেকেই বাংলার মুক্তিকামী মানুষ আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রধান দৈনিকগুলো কীভাবে জনগণকে উজ্জীবিত রেখেছে। প্রতিদিন কখন সংবাদপত্র পৌঁছাবে, এর জন্য প্রতীক্ষা। ঢাকা শহরে সকালে পত্রিকা বিলি হলেও মফস্সলে পত্রিকা পৌঁছাতে বিকাল কিংবা পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। পত্রিকাপাঠকের এই প্রতীক্ষা ছিল দেশমাতৃকার জন্য ভালোবাসা এবং মাতৃভূমির মুক্তির নেশায় আকুল করা মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশগ্রহণ। অকুতোভয় সাংবাদিকরা একাত্তরের মার্চে জনগণের মনের আকুতি এবং চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্র করে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন। উদাহরণ আছে, কোনো কোনো সাংবাদিক পাকিস্তানি বাহিনীর পদলেহন করে তোষামোদের রাজনীতি করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাও করেছেন। জাতি তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে।

২৫ মার্চ ক্র্যাকডাউনের পর ২৬ মার্চ থেকে সংবাদপত্রগুলোর ওপর নেমে এলো প্রচণ্ড সেন্সরশিপের খড়্গ। পত্রিকা অফিসগুলো বন্ধ হয়ে যেতে থাকল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তদারকি বেড়ে এমন পর্যায়ে দাঁড়াল যে কোন বিষয় ছাপা হবে আর কোনটা হবে না, তা তারাই নির্ধারণ করে দিত। এর মধ্যেও অনেক সাংবাদিক অতি কৌশলে লেখালেখি করতেন কিংবা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখতেন যাতে পশ্চিমা মিলিটারিরা তা বুঝতে না পারে; কিন্তু দেশের মুক্তিকামী মানুষ ঠিকই বুঝতে পারে। উপস্থাপন কৌশলে সাংবাদিকরা সেসময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ইত্তেফাকের সিরাজুদ্দীন হোসেনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। ২৫ মার্চ রাতে দৈনিক ইত্তেফাক অফিস আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। দৈনিক সংবাদ ও ডেইলি পিপল-এর অফিসও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিক আবেদ খান ইত্তেফাকে আটকা পড়েছিলেন সেই রাতে, পরের দিন সকালে বের হয়ে বাইসাইকেলে সারা শহর ঘুরে পাকিস্তানি সেনাদের তাণ্ডবের দৃশ্য দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেসব পরবর্তী সময়ে ভারতে গিয়ে প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিক কামাল লোহানী লিখেছিলেন, 'বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত'। এই লেখা প্রকাশের পর চারদিকে হইচই পড়ে গিয়েছিল। এছাড়াও অনেক সাংবাদিকের কথা মনে করার মতো, আর তারা হলেন শহীদুল্লা কায়সার, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, এস এ মান্নান (লাডু ভাই), সৈয়দ নাজমুল হক, একেএম

শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের), সেলিনা পারভীন, আবুল বাশার, শিবসাধন চক্রবর্তী, চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান, মুহম্মদ আখতার, খোন্দকার আবু তালেব প্রমুখ।

এদিকে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের কথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল বিদেশি সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী সব বিদেশি সাংবাদিককে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং পরের দিন এয়ারপোর্টে নিয়ে দেশের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অতি কৌশলে কয়েকজন সাংবাদিক হোটেলের ছাদে কিংবা অন্যত্র লুকিয়ে থেকে বিদেশি সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। সেসব ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী! জীবন একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে সেসব বিদেশি সাংবাদিক পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ, লুট, ধর্ষণ প্রভৃতি সব ধরনের বর্বরতা তুলে ধরতে পেরেছিলেন। এসব ধ্বংসলীলা ও নিহতদের নিয়ে অনেক রিপোর্ট, ছবি ও ভিডিয়ো বিদেশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের তালবাহানা এবং তাদের মনোবৃত্তি বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং অনেক সাংবাদিক শেখ মুজিবকে কাভার করার জন্য ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেসময়ে বিবিসি বাংলা বিভাগ ও আকাশবাণীর সংবাদ বিশেষভাবে বাঙালিদের পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরে সংবাদপ্রবাহ টিকিয়ে রেখেছিল। এদিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের খবর ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানা অনুষ্ঠান প্রচার করত। বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অনেক সাংবাদিক খবরাখবর পরিবেশন করতেন।

বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বিদেশের গণমাধ্যম' বিষয়ে মফিদুল হক অন্যত্র আলোচনা করেছেন।

ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার সায়মন ড্রিং, যিনি কম্বোডিয়ার রাজধানী নম্পেনে ছিলেন, তার অফিসের নির্দেশে ঢাকা চলে আসেন ৬ মার্চ। ৭ মার্চ শেখ মুজিবের ভাষণ শুনেন এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেন। অতঃপর শেখ মুজিবের সঙ্গে আন্তরিকভাবে পরিচিত হন তিনি। সায়মন ড্রিং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকতেন। ২৫ মার্চ অন্য সাংবাদিকদের অবরুদ্ধ করা হলে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকেন এবং ২৭ মার্চ কারফিউ উঠে গেলে ওই হোটেলের কর্মচারীদের সহায়তায় ছোট্ট এক গাড়িতে ঢাকা শহরের ধ্বংসযজ্ঞ ঘুরে দেখেন।

সায়মন ড্রিংক 'ট্যাংক্স ক্র্যাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান' শীর্ষক এক রিপোর্ট লেখেন, সেটি ডেইলি টেলিগ্রাফে ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর প্রথম দফার গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেন সায়মন ড্রিং।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্টও ছিলেন সায়মনের সঙ্গে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশ, ধ্বংসলীলা এবং নিষ্প্রাণ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের ছবি তোলেন লরেন্ট এবং সেসব ছবি জার্মান দূতাবাসের সহায়তায় পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস ছিলেন একই সঙ্গে করাচির মর্নিং নিউজ-এর সাংবাদিক ও ব্রিটেনের সানডে টাইমস সংবাদদাতা। জানা যায়, পাকিস্তান সরকার আটজন সাংবাদিককে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা একেবারে স্বাভাবিক' এটা বোঝানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই অবস্থা অ্যান্থনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি ১৮ মে সানডে টাইমস-এর লন্ডন অফিসে গিয়ে হাজির হন এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই রিপোর্ট ছাপানোর আগে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস পাকিস্তানে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসেন। তার সাড়া জাগানো রিপোর্ট 'জেনোসাইড' সানডে টাইমসে ১৩ জুন দুই পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। এই রিপোর্টে হাইলাইট করা হয় এই লিখে, 'The background to the writing and publication of this remarkable report is told on Page One'. জানা যায়, এই রিপোর্ট পড়ে ভারতের সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সানডে টাইমস-এর সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্সকে জানিয়েছিলেন যে, এই রিপোর্টটি তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই রিপোর্ট শ্রীমতী গান্ধীকে মস্কো এবং ইউরোপের দেশগুলোর রাজধানীতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে সাহায্য করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে বিবিসির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সংবাদদাতা ছিলেন মার্ক টালি। বিবিসি বাঙালিদের কাছে সেসময়ের অন্যতম প্রিয় নাম। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় প্রচারিত সংবাদ ও অনুষ্ঠানের জন্য। জনসাধারণ কৌতূহলসহকারে অপেক্ষা করত বিবিসির সংবাদের জন্য। মার্ক টালি ২৫ মার্চের পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হামলার সময় ঢাকা অবস্থান করছিলেন। পরে তাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনীর বিদেশি সাংবাদিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে মার্ক টালি আবার বাংলাদেশে আসেন। তিনি ভারত থেকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো ঘুরে ঘুরে যুদ্ধের খবর পাঠাতেন এবং শরণার্থীশিবির গিয়ে মানবিক দুর্দশা অবলোকন করে বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট করতেন বিবিসির জন্য।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গ ঢাকায় ছিলেন ২৫ ও ২৬ মার্চ। গণহত্যার খবর প্রকাশ করার কারণে পাকিস্তানি বাহিনী তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। ২৮ মার্চ সিডনি 'In Dacca, Troops use Artillery to halt revolt' নাম দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যা ও বর্বরতার রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তিনি ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্কে করে তিনি ঢাকা প্রবেশ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সিডনি শনবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসে অনেক রিপোর্ট পরিবেশন করেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ অনেক কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে ভারতের কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের নানান দিক পরিবেশন করে দেশের মানুষকে সচেতন ও বিশ্বজনমত সৃষ্টি করতে সরাসরি অবদান রেখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনের সাংবাদিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর তথা মুক্তাঞ্চল থেকে অনেক পত্রিকা বের হতো। এগুলোর মধ্যে 'দৈনিক জয়বাংলা' নওগাঁ থেকে প্রকাশিত হতো। আলোচ্য সময়ে অনেক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রকাশিত হতো। এগুলোর মধ্যে সোনার বাংলা, সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ, মুক্তি, অগ্রদূত, সাপ্তাহিক দাবানল, রণাঙ্গন, সাপ্তাহিক দুর্জয় বাংলা, সাপ্তাহিক আমার দেশ, শিক্ষা, স্ফুলিঙ্গ, সংগ্রামী বাংলা, অভিযান, সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা প্রভৃতি। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বের হতো জয়বাংলা (আওয়ামী লীগ), মুক্তিযুদ্ধ (কমিউনিস্ট পার্টি), নতুন বাংলা (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মোজাফফর) প্রভৃতি।

জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্তত ৬৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 'জয় বাংলা' নামে অন্তত চারটি এবং 'বাংলাদেশ' নামে সাতটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। (হাসিনা আহমেদ, ইতিহাসের অমূল্য দলিল)। এসব পত্রপত্রিকা জাতিকে শুধু সংবাদই পরিবেশন করেনি, বরং জাতির মনোবল উজ্জীবিত রেখেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস সঞ্চারিত করেছে।

লেখক: সম্পাদক, আজকের পত্রিকা; সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার, বাংলাদেশ এবং সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধই সাংবাদিকদের বড়ো আকর্ষণ

অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে ২০২১ সালে। স্বাধীনতা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খুলে দিয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ একটি মর্যাদাশীল দেশের নাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিকামী সব মানুষের কাছে স্মরণীয় ব্যক্তি, অনন্য প্রেরণা। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বিশ্বে দূরদর্শী, সৎ ও উদ্ভাবনী রাষ্ট্রনায়কদের সারিতে উজ্জ্বল একটি নাম। সর্বত্র কত সংবাদ-উৎস। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ এখনো বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদের কাছে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। বাংলাদেশের এমন কোনো গ্রাম বা শহর নেই–এমনকি এমন কোনো পরিবার নেই, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নেই।

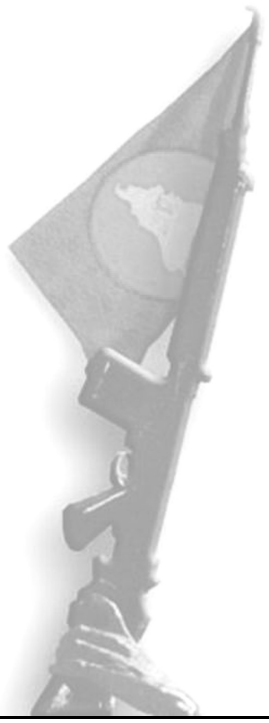

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জ্যাকব। তিনি আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে 'What is courage' প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বলা হয়– '1971 Bangladesh.' এমন অতুলন সাহস-সংকল্প এবং আত্মত্যাগ যে সংবাদকর্মীদের কাছে দশকের পর দশক প্রধান আকর্ষণ বিষয় হয়ে থাকবে, তাতে বিস্ময় কী? রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যতবার গিয়েছি, অবধারিতভাবে চোখ আটকে গেছে 'রেহানার জামা'য়। মাত্র চার মাস বয়স হয়েছিল খুলনার সেনহাটি এলাকার আবদুস সালাম খানের মেয়েটির, নাম যার রেহানা। ১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল পাকিস্তানের একদল সৈন্য রেহানাকে তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বুটের তলায় পিষে হত্যা করে। কেমন দেখতে ছিল রেহানা? ১৯৭১ সালে গ্রামের নিম্নবিত্ত একটি পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করার পর ছবি তুলে রাখার কথা ভাবা হতো না। অতএব, রেহানার কোনো ছবি তোলা হয়নি। তাকে চিনতে হলে আমাদের কেবল তার পরনের জামাটির ওপর নির্ভর করতে হয়। রেহানার অপরাধ কী ছিল? তাঁর জন্মের আগে আধাসরকারি মুজাহিদবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন আবদুস সালাম খান। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন করার জন্য পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। ক্রমে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের সর্বত্র। পাকিস্তানি সৈন্যরা চিহ্নিত হয় দখলদার বাহিনী কিংবা হানাদার বাহিনী হিসাবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। ঘড়ির কাঁটায় তখন ২৬ মার্চ। গ্রেফতার হওয়ার আগেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যা ওয়্যারলেস ও টেলিফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের নানা প্রান্তে এবং বিশ্বের সর্বত্র। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক সমাবেশে আহ্বান জানিয়েছিলেন–'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের

পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পার্লামেন্টে নির্বাচিত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাংলাদেশে গণহত্যা অভিযান শুরু করায় পাকিস্তান পরিণত হয় শত্রুরাষ্ট্রে। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে নেওয়া হয় এই শত্রুরাষ্ট্রে। গ্রেফতার হওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানান স্বাধীনতা রক্ষা এবং শত্রুসেনাদের পরাভূত করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিতে। শিশু রেহানার বাবা আবদুস সালাম খান সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। এমন সাড়া এসেছিল আরও লাখ লাখ কিশোর-তরুণের কাছ থেকে। তাদের কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক-খেতমজুর কিংবা কারখানার শ্রমিক। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেকেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অস্ত্র তোলে নেন। ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা অতুলন সাহস ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু একাত্তরে গ্রামে-গ্রামে, শহরে-বন্দরে মুক্তিযোদ্ধারা যেসব গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেছেন কিংবা যখন সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়েছেন–কোনো ছবিই কিন্তু ক্যামেরায় ধরা নেই। 'আজ ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ'–এমন আনন্দের খবরও আসেনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো সংবাদপত্রে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাসংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী আত্মাহুতি দেন। বলা যায়, এ মহতী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ধূলিকণা স্বাধীনতাসংগ্রামের শহিদদের রক্তে ভেজা। তাদের মধ্যে ছিলেন চিশ্‌তী হেলালুর রহমান, যিনি ছাত্র আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি দৈনিক আজাদ পত্রিকায় সংবাদকর্মী হিসাবে কাজ করতেন। ২৫ মার্চ ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে (পূর্বতন ইকবাল হল) হত্যার পর তার মরদেহ রেখে দেওয়া হয়েছিল ক্যান্টিনের সামনে। ২৭ মার্চ সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার হলে তার মরদেহ আমি দেখেছি, পাশে ছিল নিহত আরও কয়েকজনের লাশ। তাদের পাশে ছিল কয়েকটি ডামি রাইফেল, যা দিয়ে ২৫ মার্চের আগে ছাত্রছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জগন্নাথ হলের গণকবরে দেখেছি, গণহত্যার শিকার কয়েকজনের শরীরের অংশ বের হয়ে ছিল। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন, সেই তালিকায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী। ওই সময়ে কিংবা এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী ছিলেন–এমন অনেকেই বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মান অর্জন করেছেন। যদিও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং সম্মানের সঙ্গে প্রদর্শন করতে না পারা পরিতাপ ও লজ্জার।

জেনোসাইডের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে 'চ্যান্সেলর' টিক্কা খানকে ঘাতকের দায়িত্ব পালনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা নানাভাবে সহযোগিতা দিয়েছে, তাদের অপরাধ সম্পর্কেও কি আমরা নতুন প্রজন্মকে অবগত করাতে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছি? সংবাদকর্মীরা কি এ প্রশ্ন করি–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' কেন নেই? এ যুগের সংবাদকর্মীরা সেই কঠিন সময়ের আলোকচিত্র খুঁজে পাবেন না। কারণ, আলোকচিত্র তোলার মতো পরিবেশ ছিল না। এ ভূখণ্ড ছিল মৃত্যু উপত্যকা। পাকিস্তানিরা গণহত্যা পরিচালনা করছে, এ ছবি কে তুলে রাখবে? এখনকার মতো প্রযুক্তিগত সুবিধাও ছিল না। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে কুষ্টিয়া এলাকার কিছু আলোকচিত্র আমরা দেখি। সেসব ছবি তুলেছেন মূলত বিদেশি সংবাদকর্মীরা। তাদের সংরক্ষণ সুবিধা ছিল এবং কেউ কেউ পরবর্তী সময়ে তা প্রকাশও করেছেন। 'মুক্তির গান' নামের যে অনন্যসাধারণ চলচ্চিত্র আমরা দেখি তা তুলেছিল একদল বিদেশি। তারেক মাসুদের কৃতিত্ব যে কয়েক দশক পর তিনি 'হিমাগার' থেকে তা উদ্ধার করতে পেরেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের ভূমিকায় নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ যেসব তরুণ সংবাদকর্মীর বিষয়বস্তু, তাদের কাছে 'মুক্তির গান' কেবল মুক্তিযুদ্ধকে জানার জন্য নয়, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পাঠের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। দেশে কিংবা বিদেশে, কোথায় ছড়িয়ে আছে 'মহান একাত্তরের আলোকচিত্র এবং প্রকাশিত লেখা'–সেসব অনুসন্ধানে গবেষকরা অবশ্যই মুখ্য ভূমিকা রাখবেন। তবে সংবাদকর্মীরাও উদ্যোগী হতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী অনেকে এখনো সক্রিয় জীবনে রয়েছেন। ওই কঠিন সময় দেখেছেন–এমন অনেক নারী-পুরুষের কাছেই 'মুক্তিযুদ্ধ' যেন সেদিনের ঘটনা। তাদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি আরও ভালোভাবে জেনে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল যে লাল-সবুজ-সোনালি রঙের পতাকাকে স্যালুট দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শপথ নিয়েছিল মুজিবনগরের আম্রকাননে, তা প্রথম উড়েছিল ২ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণের বটতলায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্ষোভ-রোষ ফেটে পড়েছিল বটগাছটির ওপর। 'চ্যান্সেলর' টিক্কা খানের নির্দেশে বটগাছটি সমূলে উপড়ে ফেলা হয়, যেমন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে নির্মিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সাহস-সংকল্প-শপথের জাতীয় প্রতীক হিসাবে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় শহিদমিনার। ২৫ মার্চ রাতেই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল জগন্নাথ হল, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলসহ বিভিন্ন ছাত্রাবাসে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যবই জোগানোর প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ কাউন্সিল আক্রমণের শিকার হয়। সেখানে হত্যা করা হয় প্রহরায় থাকা আটজন পুলিশ সদস্যকে। 'মুক্তিযুদ্ধের ওয়াকিং মিউজিয়াম' কর্মসূচির আওতায় ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন এবং মার্কিন দূতাবাসের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে ব্রিটিশ কাউন্সিলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পুলিশ হত্যার ঘটনা তুলে ধরার সময় তারা বলেন–নিহত পুলিশ সদস্যরা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিল। সেদিন পর্যন্ত তারা ছিলেন সরকার নিযুক্ত কর্মী। পাকিস্তান আর্মিও সরকার দ্বারা পরিচালিত। তাহলে কেন তারা পুলিশবাহিনীর সদস্যদের হত্যা করল? এর উত্তরে আমি বলি–পাকিস্তানিদের কাছে প্রতিটি বাঙালিই ছিল শত্রুর তালিকায়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, চাকরিজীবী, বস্তিবাসী–এমনকি ঘরে থাকা নারী ও শিশুও তাদের টার্গেট ছিল। ড. জিসি দেব, ড. মুনিরুজ্জামান, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাসহ অনেক সম্মানিত শিক্ষককে তারা হত্যা করে। মধুর ক্যান্টিনের কর্ণধার মধুসূদন দে নিহত হন পরিবারের সদস্যসহ। জগন্নাথ হল ও আশপাশে নিহতদের বেশির ভাগকে ২৬ মার্চ সকালে গণকবর দেওয়া হয় জগন্নাথ হলের মাঠের এক কোণে। কোনো সংবাদকর্মী নন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নুরুল-উলা চরম ঝুঁকি নিয়ে তার বাসভবনের জানালায় মুভি ক্যামেরা সেট করে জগন্নাথ হলের মাঠে সংঘটিত গণহত্যার চিত্র ধারণ করে রেখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি তাঁকে স্মরণ করে?

মাসুমা খাতুন ছিলেন পাকিস্তান টেলিভিশনের কর্মী। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে। অনুষ্ঠান ঘোষণা করতেন তিনি। তখন সন্ধ্যার দিকে ঘণ্টাদুয়েক অনুষ্ঠান হতো।

সবকিছুই ছিল লাইভ। পৃথিবীতে বাংলা ভাষায় প্রথম টেলিভিশনের কার্যালয় ও স্টুডিয়ো ছিল বর্তমান রাজউক ভবনে, তখন বলা হতো ডিআইটি ভবন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরপরই বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এ ভূখণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা টেলিভিশন কেন্দ্রটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। শিল্পী-কলাকুশলী প্রায় সবাই বাঙালি। তারা কাজ করছিলেন মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে। প্রতিরাতে অনুষ্ঠানের শেষে অবশ্য পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো এবং পতাকা প্রদর্শন করা হতো। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ বাংলাদেশের সর্বত্র 'জাতীয় পতাকা' উত্তোলনের আহ্বান জানায়। এ দিনটি পাকিস্তান দিবস হিসাবে পালিত হতো। খ্যাতিমান শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন। মার্চের প্রথম থেকেই টেলিভিশনে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন হচ্ছিল। ২৩ মার্চ মুস্তাফা মনোয়ার সিদ্ধান্ত নেন, এ দিন অনুষ্ঠান শেষে পাকিস্তানের পতাকা দেখানো হবে না। তবে কাজটি করতে হবে খুব কৌশলে। পাকিস্তানের সৈন্যদের বোকা বানাতে হবে। মাসুমা খাতুনের কাছে জানতে চান–স্বাভাবিক সময়ের পরও ঘণ্টাদুয়েক টেলিভিশনে থাকতে পারবেন কি না। তিনি গৌরবের এক মুহূর্তের সাক্ষী হতে উৎসাহের সঙ্গে রাত ১২টার পরও থাকতে রাজি হয়ে যান। ২৩ মার্চ নির্ধারিত সময়ের পরও দেশাত্মবোধক গান শোনানো হতে থাকে টেলিভিশনে। পাকিস্তান আর্মি অফিসাররা কিছু সময় পর পর এসে জানতে চায়–কেন এত রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলছে। তাদের বলা হয়–আজ পাকিস্তান দিবস, স্পেশাল ডে। তাই অতিরিক্ত সময় অনুষ্ঠান চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অবশেষে এলো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। উপস্থিত সবাই শিহরিত। মাসুমা খাতুন মাইক্রোফোনে বলেন–'এখন রাত ১২টা ২ মিনিট। আজ ২৪ মার্চ। আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ।' ২৩ মার্চ পাকিস্তান টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রে পাকিস্তানের পতাকা দেখায়নি। অফিসের নিচে গাড়ি প্রস্তুত ছিল। মাসুমা খাতুনকে নিয়ে দ্রুত ডিআইটি ভবন এলাকা ছেড়ে যান চালক। একদিন পরেই আসে ২৫ মার্চ, অভিশপ্ত দিন–কালরাত্রি। অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়ন শুরু হয়। মাসুমা খাতুন পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর টার্গেট হন। পালিয়ে থাকতে হয় তাঁকে। তাঁর ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম (পরে জাতীয় অধ্যাপক)। ১৯৫২ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি এবং পরের অবিস্মরণীয় দিনগুলোর ঘটনা যিনি ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন। স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনিও সামনের সারিতে। বোনকে নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য ঝুঁকি নেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে, কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাকে হত্যার জন্য খুঁজেছিল। একাত্তরের ডিসেম্বরের প্রথমদিকে ঢাকা মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্রবাহিনী অভিযান শুরু করে। মাসুমা খাতুন তখন নিঃপ্রদীপ মহড়া দেখেছেন। অন্ধকারে ছেয়ে যেত রাতের ঢাকা। ১৬ ডিসেম্বর বিকালে রেসকোর্সে পাকিস্তানি বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। পরদিন নতুন সূর্য ওঠে। বিকালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়–ঘোষণায় মাসুমা খাতুন।

একালের সাংবাদিকদের কাছে মাসুমা খাতুন ও মুস্তাফা মনোয়ার আইডল হতে পারেন। স্বাধীনতার জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁদের কথা বর্তমান বাংলাদেশ জানুক, বিশ্ব জানুক–এ দায়িত্ব একালের সংবাদকর্মীদের। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকবেন মুক্তিসংগ্রামীরা।

> ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেউ যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে, ইতিহাস বিকৃতি যেন কেউ করতে না পারে–এক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে একালের সংবাদকর্মীদের। এটাও তাদের কাছে 'মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংবাদিকতা'। তারা একাত্তরের রণাঙ্গনে থাকতে পারেননি; কিন্তু সেসময়ের সত্য সামনে আনতে পারেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে, তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' অথচ একটি মহল স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে অনাবশ্যক প্রশ্ন তোলে। তারা আসলে মতলববাজ। পাকিস্তানের দুঃশাসন থেকে মুক্ত বাংলাদেশকে তারা মেনে নিতে পারে না। এ কারণে কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণাকেই বিতর্কিত করতে চায়। একালের সাংবাদিকদের দায়িত্ব এই অপশক্তির মুখোশ উন্মোচন করা। কেবল ইতিহাসের সত্য তুলে ধরা নয়, উন্নত বিশ্বের সারিতে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে হলে প্রেরণা যে একাত্তর!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণার ম্যান্ডেট দিয়েছিল ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ

নির্বাচনের মধ্যদিয়ে। প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কের মতোই তিনি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতে পারেন, দূরদর্শিতা দেখান এবং অপেক্ষা করেন উপযুক্ত সময়ের। ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন যখন স্থগিত হয়ে যায়, স্পষ্ট হয়–স্বাধীনতা ঘোষণার সময় এসে গেছে। ৭ মার্চ ঘোষণা দেন–এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ অধিবেশন শুরু হয়। উদ্‌বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র ৭ কোটি বাঙালির ওপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধের ঘোষণা করত, তবে আমরা সে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা ২৫ মার্চ অতর্কিত আমাদের আক্রমণ করল। তখন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।...দেশবাসী জানেন, একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।'

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালেক 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, ২৫ মার্চ প্রায় মধ্যরাতে অপারেশন সার্চলাইট প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য প্রায় এক কিলোমিটার অতিক্রম করার পর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হওয়া আর্মির প্রথম কলাম ফার্মগেটের কাছে প্রথম বাধার সম্মুখীন হয়। বড়ো একটি গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের শত শত কর্মী 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছিল। জেনারেল টিক্কা খানের সদর দপ্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের তেজোদীপ্ত স্লোগান শুনতে পাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের একঝাঁক গুলি ভেসে এলো। হালকা মেশিনগানের গুলিও চলল। ১৫ মিনিট পর স্লোগান থেমে গেল। সাময়িকভাবে অস্ত্রের জয় হলো। আর্মি কলাম এগিয়ে চলল ঢাকার বিভিন্ন টার্গেটে। ডেভিড লোসাক 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' গ্রন্থে (পৃ. ৯৮-৯৯) লিখেছেন, প্রথম গুলির শব্দ যখন শোনা গল, শেখ মুজিবের কণ্ঠ ভেসে এলো। এটা ছিল অবশ্যই পূর্বে রেকর্ডকৃত বার্তা। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন (উইটনেস টু সারেন্ডার, পৃ. ৭৪-৭৫)।

নিউইয়র্ক টাইমস ২৭ মার্চ লিখেছে, 'পাকিস্তান রেডিয়ো আজ জানিয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে তার অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর গ্রেফতার করা হয়েছে।' টাইমস অব ইন্ডিয়া ২৭ মার্চ লিখেছে, 'শেখ মুজিবুর রহমান সার্বভৌম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন।' ব্যাংকক পোস্ট লিখেছে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই দলটির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব অংশের প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ ঘোষণার পর এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ উইক সাময়িকী ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। এর শিরোনাম ছিল: 'পোয়েট অব পলিটিক্স' অর্থাৎ রাজনীতির কবি। এতে লেখা হয়, 'গত সপ্তাহে শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর কোনো কোনো সমালোচক বলল–কট্টর সমর্থকদের চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মুজিব নতুন বাঙালি 'জাতির' যুদ্ধকালীন নেতায় পরিণত হয়েছেন। আর এটাই বাঙালি জাতির জন্য তার আজীবন লড়াইয়ের পুরস্কার। উর্দু, বাংলা, ইংরেজি–এই তিন ভাষায় অনর্গল বক্তব্য দিতে পারতেন তিনি। তিনি নিজেকে কখনো পণ্ডিত দাবি করেন না। তিনি প্রকৌশলী নন, রাজনীতির কবি।' (নিউজ উইক, ৫ এপ্রিল ১৯৭১)

১৯৭২ সালের জুলাইয়ের শেষদিকে ইরানের কায়হান ইন্টারন্যাশনালের সাংবাদিক আমির তাহেরিকে টিক্কা খান বলেন, শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার নিজে শুনেছে। তাই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমি খুব ভালো করে জানতাম, মুজিবের মতো একজন নেতা তাঁর জনগণকে পরিত্যাগ করবে না। বাসায় না পেলে তাকে গ্রেফতারের জন্য গোটা ঢাকা শহর খুঁজতাম, একটি বাড়িও তল্লাশির বাইরে রাখতাম না। (সূত্র: বাংলাদেশ সরকার: ১৯৭১-১৯৭৫, এইচটি ইমাম, পৃ. ৬৪)

যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জানায়: শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দুই অংশের পূর্ব অংশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করার পর পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ তাদের বিভিন্ন দূতাবাসে টেলিগ্রাম প্রেরণ করে জানিয়েছে: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পর ২৫-২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। সেনাবাহিনী ঢাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ট্যাংক ও অন্যান্য মারণাস্ত্র নিয়ে অভিযান শুরু করেছে। তারা কারফিউ জারি করেছে। তাদের আচরণ নিষ্ঠুর। ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছেন। আওয়ামী লীগ নেতারা আত্মগোপনে গিয়েছেন। গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিরোধের খবর প্রচার হচ্ছে। শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রচার হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রিসার্চ স্টাডি (ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ) ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান সংকট বিষয়ে পূর্ববর্তী এক বছরের ঘটনার সারসংক্ষেপ করে লিখেছে, '২৬ মার্চ ১৯৭১–স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করছে। বেতার কেন্দ্র বলছে–শেখ মুজিবুর রহমান সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন।'

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেউ যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে, ইতিহাস বিকৃতি যেন কেউ করতে না পারে–এক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে একালের সংবাদকর্মীদের। এটাও তাদের কাছে 'মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংবাদিকতা'। তারা একাত্তরের রণাঙ্গনে থাকতে পারেননি; কিন্তু সেসময়ের সত্য সামনে আনতে পারেন। গণহত্যা বাংলাদেশজুড়ে: পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে নিষ্ঠুর গণহত্যা শুরু করে। ঢাকা ট্যাংকের শব্দে কেঁপে ওঠে। বোমা নিক্ষেপ করা হয় যততত্র। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা সৈন্যরা ঠান্ডামাথায় নারী-পুরুষ-শিশুদের হত্যা করতে থাকে। বস্তিতে আগুন দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প এবং পিলখানার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সদর দপ্তর নিষ্ঠুর হামলার শিকার হয়। নানা স্থানে দেখা যায় মরদেহের স্তূপ। সিদ্দিক সালেক লিখেছেন, '২৫ মার্চ রাতে হামলা প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বলেন, বাঙালিদের উচিত শিক্ষা দেওয়া গেছে–অন্তত একটি প্রজন্মের জন্য।' মেজর সালেক তার সঙ্গে যোগ করেন–হ্যাঁ, তারা কেবল অস্ত্রের ভাষা বোঝে। ইতিহাস সেটাই বলে। (উইটনেস টু সারেন্ডার, পৃ. ৭৮)

২৬ মার্চ সন্ধ্যায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক পদক্ষেপের সাফাই গাইতে গিয়ে সব দায় চাপান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর। তিনি দম্ভোক্তি করে বাঙালি জাতির প্রিয় নেতাকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে অভিহিত করে বলেন, 'এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে।'

২৫ মার্চ জগন্নাথ হলে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেই দৃশ্য কারও ধারণ করে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ২৬ মার্চ জগন্নাথ হলে

পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যার দৃশ্য ভিডিয়ো ক্যামেরায় ধারণ করে রেখেছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. নূরুল উলা। '১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' সাহিত্য প্রকাশ প্রকাশিত গ্রন্থে তিনি 'গণহত্যার ছবি' শিরোনামে লিখেছেন: '...জীবনে এই প্রথম মানুষ মারা দেখলাম, আর সেটাও আহত লোককে ঠান্ডামাথায় গুলি করে।...রাস্তা দিয়ে সামরিক গাড়ি মাইকে কারফিউ-এর ঘোষণা প্রচার করতে করতে গেল আর সেই সঙ্গে জানিয়ে গেল কেউ যেন জানালা দিয়ে বাইরে না তাকায়। অল্পক্ষণ পরে কিছু সৈন্য আরও কয়েকজন আহত লোক নিয়ে এলো, এবারও পশ্চিম দিকের ছাত্রাবাস থেকে। তারপর শুরু হলো গুলি, অনেকটা এলোপাতাড়ি।...মাঠের ওপর পড়ে থাকা লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকল।...পরপর দুবার এভাবে আহত আর নিরস্ত্র মানুষদের ঠান্ডামাথায় খুন করতে দেখে বুঝলাম আজ একটা সামগ্রিক গণহত্যা হবে।'

ড. নূরুল উলা জগন্নাথ হলের দক্ষিণ পাশে প্রধান গেটসংলগ্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারের জানালায় ক্যামেরা লাগিয়ে ছবি তুললেন। তাতে কী ধরা পড়েছে? তিনি লিখেছেন: 'বন্দী আনা শুরু হয়েছে মাঠের পূর্বদিক থেকে। যাদের নিয়ে আসা হচ্ছে তাদের পরনে লুঙ্গি, গেঞ্জি অথবা খালি গা।...আগের লাশগুলোর কাছে নিয়ে এসে ওদের ওপর গুলি করা হচ্ছে।...জনাদশেক সৈন্য মাঠের পূর্বদিক থেকে আবির্ভূত হলো। সঙ্গে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশজন মানুষ। ভাবলাম বোধহয় লাশ সরাবার জন্য এনেছে।...কিন্তু...শুরু হলো গুলি। গুলির পর গুলিবর্ষণ হচ্ছে আর মানুষগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে...।

দাড়িওয়ালা লোকটা আবার হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইতে শুরু করল।...তার ওপর চালালো গুলি। তার মৃতদেহ আর সবার সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। বেলা একটার দিকে একটা প্রকাণ্ড বুলডোজার দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছি।'

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং অফিসার ও কর্মীরা কি ড. নূরুল উলার জীবনকথা জানেন? যে সাহস নিয়ে তিনি মুভি ক্যামেরায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার ছবি ধরে রেখেছেন, ধরা পড়লে শুধু তার নয়, গোটা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসিন্দাদের চরম বিপদ হতো–এটাই তো দুঃসাহসী সাংবাদিকতা! সাংবাদিকতা শিক্ষার পাঠক্রমে তিনি নিশ্চিতভাবেই আসতে পারেন।

কালীরঞ্জন শীল '১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' বইয়ে 'জগন্নাথ হলেই ছিলাম' শিরোনামে লিখেছেন: 'কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি ঠিক নেই। তবে শেষ যে লাশটি টেনেছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের।...আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদেরও দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে শব্দ করে কোরানের আয়াত পড়ছিল।...গুলি করল তাদের সবাইকে। বন্ধ হয়ে গেল কোরানের আয়াত পড়া। আমরা কোনোরকমে সুনীলের লাশটি টেনে জড়ো করা লাশগুলোর পশ্চিমদিকে নিয়ে যাই। সামনেই দেখি ড. জি সি দেবের মৃতদেহ, ধুতি পরা, খালি গা। ক্ষতবিক্ষত সারা শরীর।...কী ভেবে আমি ড. দেবের লাশের পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশ ধরা অবস্থাতেই শুয়ে পড়লাম।...এভাবে মরার মতো কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারব না।...মাথা তুলে দেখি যেদিকে পাকসেনাদের গাড়ি ও অসংখ্য মিলিটারি ছিল, সেদিকে কোনো গাড়ি বা মিলিটারি নেই। চতুর্দিকে একনজর দেখে নিলাম। নুয়ে নুয়ে বস্তির মধ্যে গেলাম।...গায়ে সেই ছোপ ছোপ রক্ত নিয়েই ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। রেললাইনের দুপাশের বস্তি পোড়া, ভাঙা।...বুড়িগঙ্গা নদী মাঝি পার করল বিনে পয়সায়।'

কালীরঞ্জন শীল যেমন অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, তেমনই একটি ঘটনা জানা যায় 'মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক জীবনকোষ'-এর প্রণেতা ডা. বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজের সূত্রে: ঘটনাটি সৈয়দপুরের। 'বিহারি' কিংবা 'অবাঙালি' জনগোষ্ঠীর অনেকের বসতি ছিল এ এলাকায়। ৯ এপ্রিল একজন অবাঙালি এসে আর্মি ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যায় নারায়ণ প্রসাদ এবং তার ছোটো ভাইকে। তাদের সঙ্গে আরও ২৩-২৪ জনকে তোলা হয় একটি রেলগাড়ির বন্ধ ওয়াগনে। গন্তব্য সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে চলে নিষ্ঠুর অত্যাচার। মারধরের সময় 'কাফের লোক কো খতম করো' বলে গালি দিত। কয়েকজন মুসলমানকে নামাজ পড়ে কি না জিজ্ঞাসা করায় তারা 'হ্যাঁ' বললে বলা হয় 'তোম লোগ ঝুট বলতা হ্যায়'। ১২ এপ্রিল ১২টার দিকে তাদের ট্রাকে তোলা হয়। তিনটি ট্রাকে মোট দেড়শ জনের মতো হবে। এদের মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার এবং সৈনিকও ছিল। সবাইকে নেওয়া হয় রংপুর ক্যান্টনমেন্ট। পথেও পেটানো হয় রাইফেলের বাঁট দিয়ে। ক্যান্টনমেন্টে থেকে রক্তাক্ত এসব মানুষের শেষযাত্রা শুরু হয় উপশহরের বালি তোলা খাদের কাছে। প্রথমে বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছয়জন করে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এভাবে আসে সিভিলিয়ানদের পালা। খুব কাছ থেকে ছয় পাকিস্তানি সেপাহি গুলি করে ছয়জন করে হত্যা করতে থাকে। লাশের পাশে আবারও দাঁড়

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং অফিসার ও কর্মীরা কি ড. নূরুল উলার জীবনকথা জানেন? যে সাহস নিয়ে তিনি মুভি ক্যামেরায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার ছবি ধরে রেখেছেন, ধরা পড়লে শুধু তার নয়, গোটা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাসিন্দাদের চরম বিপদ হতো–এটাই তো দুঃসাহসী সাংবাদিকতা! সাংবাদিকতা শিক্ষার পাঠক্রমে তিনি নিশ্চিতভাবেই আসতে পারেন

করানো হয় ছয়জনকে। এমন নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের তৃতীয় দলে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয় নারায়ণ প্রসাদ এবং তার ছোটো ভাইকে। তারা দুজনে সামান্য কথা বলার সুযোগ পায় এবং বুদ্ধি করে গুলিবর্ষণের মুহূর্ত আগে একটু হেলে পড়েন। এর ফলে নারায়ণ প্রসাদের উরুর একটু ওপরে এবং তার ভাইয়ের হাঁটুতে গুলি লাগে। তারা দুইজন মরার ভান করে পড়ে থাকেন। সৈয়দপুরের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ও পার্লামেন্ট মেম্বার ডা. জিকরুল হককে একাই দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। হত্যাকাণ্ড শেষ হলে সবাইকে খাদে ফেলে মাটিচাপা দিতে থাকে। প্রকৃতি এ নিষ্ঠুরতা হয়তো সহ্য করতে পারেনি। তার প্রকাশ ঘটে প্রবল বর্ষণে। এ কারণে ঘাতকরা সাময়িক সময়ের জন্য ঘরে চলে যেতে বাধ্য হয়। আর এ সুযোগে অর্ধাংশ মাটিতে পোঁতা অবস্থাতেই মাটি সরিয়ে নিজেকে মুক্ত করেন নারায়ণ প্রসাদ। কয়েকদিনে অমানুষিক অত্যাচার এবং সবশেষে গুলি খাওয়ার পরও তিনি বৃষ্টিস্নাত হয়ে জীবন বাঁচাতে পারেন।

ড. নূরুল উলা, কালীরঞ্জন শীল কিংবা নারায়ণ প্রসাদ–তাদের কেউই সাংবাদিক ছিলেন না। তাঁদের কেউ জীবিতও নেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অমূল্য ইতিহাস তারা রেখে গেছেন। এ সূত্র ধরেই একালের মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতা নবরূপ পেতে পারে।

কেতনার কোলায় মাইলাই: ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের বিভিন্ন স্থানে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল। বিশ্ববিবেক বিশেষভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল মাইলাই হত্যাকাণ্ডের খবর। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে শত শত মাইলাইয়ের মতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। অথচ একাত্তরের জেনোসাইড এখনো স্বীকৃত নয়।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ। ১৬ মে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ। বরিশাল জেলার গৌরনদী কলেজে মিলিটারি ক্যাম্প থেকে একটি দল পশ্চিমদিকে গণহত্যার অভিযানে নামে। দিনভর চলে তাদের ভয়ংকর অভিযান। শত শত বাড়ি ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান পোড়া হয়। গুলি চলে অবিরাম। রাজাকার ও শান্তি কমিটির দুর্বৃত্তরা মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করেছিল–আর্মি তাদের ক্ষতি করবে না। তারা কেবল আওয়ামী লীগ, 'মুক্তি' আর হিন্দু মারে। বাস্তবে বাঙালিমাত্রই হানাদারদের শত্রু ছিল। নারী-পুরুষ-শিশু–সবাইকে টার্গেট করা হচ্ছিল। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সবাই পালাতে থাকে পশ্চিমদিকে। রাংতা এলাকার কেতনার বিল, বড়ো ধানি জমি। আর্মির তাড়া খেয়ে এ বিলের পথে পালাতে থাকে হাজার হাজার মানুষ। নানা বয়সের, নানা ধর্মের। আর্মি এসে পড়েছিল অকস্মাৎ। রাইফেল, মেশিনগানের নিশানায় পড়ে যায় তারা। বিশাল বিলের সবুজ ধান লাল হয়ে যায় রক্তে। এ যেন রক্তে ভেজা বাংলাদেশের পতাকা!

রাজাপুরে নৃশংসতা: এপ্রিলের শেষদিকে ঝালকাঠি মহকুমার রাজাপুর থানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। নৈকাঠির মতো নিভৃত গ্রামে হানাদার বাহিনী আসবে না, এটা ছিল অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু অচিরেই ধারণা ভুল প্রমাণ হলো। রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকেরা আর্মি ডেকে আনে। একের পর এক হিন্দুদের বাড়ি পুড়তে থাকল। এক প্রবীণ ব্যক্তি একসময় ছিলেন আর্মিতে। উর্দু ভাষা রপ্ত ছিল। আর্মির মুখোমুখি হয়ে তিনি উর্দুতে কথা বলেন। ফলে তাদের বাড়িটি রক্ষা পেল আগুনে পোড়ার হাত থেকে। বেশির ভাগ মুসলিম পরিবার তাতে স্বস্তি পেল। তারা আগেও হিন্দুদের নানাভাবে রক্ষা করেছে। বিশেষভাবে কিশোরী-তরুণীদের আগলে রেখেছে। এখন সাহস আরেকটু বেড়ে গেল। কিন্তু রাজাকার-শান্তি কমিটির সদস্যদের দৌরাত্ম্য কমে না। তারা দিনদিন বেপরোয়া হয়ে ওঠছে। একসময় হিন্দু পরিবারগুলোর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো, তোমরা মুসলমান হয়ে গেলে জানে বাঁচতে পারবে। দিনের পর দিন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে চলা পরিবারগুলোর সদস্যরা ভাবল, এভাবে যদি প্রাণে বাঁচা যায়, মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা পায়, ক্ষতি কী? ঠিক হলো, এক শুক্রবার পুরুষ সবাই মসজিদে গিয়ে কলমা ও নামাজ পড়বেন। অবশেষে এলো সেই অভিশপ্ত শুক্রবার। একদল হিন্দু মসজিদে গিয়ে 'কলমা পড়ে ধর্মান্তরিত হলেন'। তাদের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু বাড়ি ফিরতে চাইলে আপত্তি এলো। যারা একটু জোর করতে চাইল, তাদের দেওয়া হলো হুমকি। ঘরে ঘরে নারী-শিশুদের উৎকণ্ঠা বাড়ছে–মুসলমান হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। এখনো কেন ফিরছে না স্বামী-পুত্র-ভাইয়েরা। ওদিকে সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নওমুসলিমদের কড়া প্রহরায় রাজাকাররা নিয়ে গেল নিকটস্থ খালে বাঁধা গরুবাহী নৌকায়। ততক্ষণে সবার হাত ও পা মোটা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। নৌকা ছেড়ে দিলে অসহায় মানুষগুলো নিশ্চিত হয়ে যান তাদের কী ভয়ানক পরিণতি ঘটতে চলেছে। এই যে হিটলারের ফাইনাল সেটেলমেন্ট–বন্দিদের গাড়িতে তুলে দিয়ে বলা হতো, যেখানে নামবে সেখান থেকে একটু হেঁটে গেলেই মুক্তি। তোমরা সুস্বাদু খাবার পাবে, ভালো থাকতে পারবে। বন্দিদের নামিয়ে দেওয়া হতো যে পথে, তার শেষ ছিল গ্যাস চেম্বার। মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেত। নৈকাঠির হতভাগ্য মানুষগুলোকে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল। প্রায় অর্ধশত অসহায় যাত্রীর আর্তনাদে কেঁপে উঠল ধরণি। তাদের বাঁচার আকুতি আর ভয়ার্ত চিৎকার পৌঁছে গেল ঘরে ঘরে। তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল; কিছু দূরেই তাদের পরিবারে উঠল কান্নার রোল। পরদিন জীবিতরা সবাই গ্রাম ছাড়ল। কিন্তু শান্তি এলো না। মুসলিম পরিবারগুলোর জীবনও অতিষ্ঠ করে তুলল রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা।

পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে না!

মধুর স্মৃতি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর ক্যান্টিন, মধুর রেস্তোরাঁ কিংবা একসময়ের আদির চায়ের দোকান বা মধুর দোকান! কত যে স্মৃতি! কিংবা কত বেদনা ও যন্ত্রণা! বাবা আদিত্য চন্দ্র দে সেই ১১-১২ বছর বয়সের মধুকে নিয়ে এসেছিলেন কেবল পূর্ব পাকিস্তান নয়, এ অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে। তবে পড়াশোনার জন্য নয়, ক্যান্টিন চালানোর জন্য। সেরা ছাত্রছাত্রীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়, পাঠদান করেন যারা, তাদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন, বিশ্বসেরাদের আসনে সহজেই ঠাঁই করে নিতে পারেন। মধু তাদের সেবায় উৎসর্গীকৃত। ক্যান্টিনটি প্রথমদিকে আদির দোকান নামে পরিচিত। মধু যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পরিচিতি পায় তার নামে। ঐতিহাসিক আমতলার কাছে টিনের ঘর। বসার জন্য ছিল কয়েকটি বেঞ্চ। ছাত্রনেতারা আসে, সাধারণ ছাত্ররা আসে। পঞ্চাশের দশকে শেখ মুজিবুর রহমান এসেছেন, আতাউর রহমান খান এসেছেন। ১৯৫২ সালের অমর একুশের আন্দোলন তিনি দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তখন তিনি টগবগে যুবক। ১৯৬২ সালের দুই দফা এবং ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রও তার ক্যান্টিন। এরপর কলাভবন স্থানান্তরিত হয় নীলক্ষেতে, মধুর ক্যান্টিনের জন্য স্থান বরাদ্দ হয় নবাব পরিবারের বিনোদন ভবনে। এখানেই ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় একাধিক বৈঠক আয়োজন হয়েছিল। ছাত্র-শিক্ষক, সবার প্রিয় ছিলেন মধুসূদন দে। পাকিস্তানি গোয়েন্দারা তার কাছে প্রায়ই আসে ছাত্রনেতারা কী শলাপরামর্শ করে, আন্দোলনের কী কর্মসূচি নেয় সেসব জানার জন্য। প্রলোভন দেখায়, ভয় দেখায়। কিন্তু মধুসূদন দের মনপ্রাণ যে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে। তিনি ছাত্রনেতাদের নানাভাবে সহায়তা করেন। তাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করেন। গোয়েন্দা কিংবা মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থক ছাত্রনেতারা কী আলোচনা করে সেসব জানিয়ে দেন ডাকসু, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের। ১৯৬৯ সালের

ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এই ক্যান্টিন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মিসভার জন্য তিনি স্থান ছেড়ে দেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সভা চলে। ব্যাবসা বন্ধ রাখতে হয়। সবার মধুদা হয়ে ওঠা মানুষটি তাতে কিছু মনে করেন না। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও আসে তার ক্যান্টিনে। সবার যে প্রিয়জন তিনি! ক্যান্টিনে খেয়ে নগদ পয়সা যারা দিতে পারে না, বাকির খাতায় লিখে রাখেন। সাধারণ ছাত্ররাও বাকিতে চা-শিঙাড়া, মামলেট বা রসগোল্লা খাওয়ার সুযোগ পায়। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেলেও বাকির খাতায় নাম কাটাননি, এমন অনেকে ছিলেন। তিনি হতাশ হতেন না। কেউ কেউ চাকরি পেয়ে নিজেই এসে বকেয়া টাকা দিয়ে যেতেন। আবার তিনিও যেতেন কর্মস্থলে, বাকির খাতা নিয়ে।

২৬ মার্চ সকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রিয় এ মানুষটিকে গুলি করে হত্যা করে। শিববাড়ী এলাকায় থাকতেন তিনি। সেখান থেকে জগন্নাথ হল স্পষ্ট দেখা যায়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা অভিযান শুরু করে। অন্যতম টার্গেট জগন্নাথ হল। ২৬ মার্চ সকালে হানাদাররা হাজির হয় মধুসূদন দের বাসভবনে। জগন্নাথ হলে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ নিঃসন্দেহে টার্গেটেড। সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছিল তারা। হলটি টার্গেটেড হলেও শিক্ষার্থী ও হলের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের ওপর হামলা ছিল গণহত্যার অংশ। এখানে কেউ বিশেষভাবে চিহ্নিত নয়, সবাই টার্গেট।

কিন্তু মধুসূদন দে ছিলেন সরাসরি টার্গেট। যেমন ছিলেন ড. জি সি দেব এবং ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, রাশেদুল হাসান, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সিরাজুদ্দীন হোসেন, ডা. আলিম চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বি–এসব বরেণ্য বুদ্ধিজীবীকে কুখ্যাত আলবদর বাহিনী টার্গেট করে হত্যা করেছিল। মধুসূদন দেকেও পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার অবস্থান চিহ্নিত করে পাকিস্তানি সৈন্যরা হাজির হয় বাসভবনে। যে রাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনস ও পিলখানার ইপিআর সদর দপ্তর টার্গেটের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মধুসূদন দেকে গুলি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাধারণ ক্যান্টিনের মালিক, চা-শিঙাড়ার মতো কম দামের খাবার ছাড়া আর কিছু মেলে না যেখানে, তিনি পাকিস্তান আর্মির কাছে বিবেচিত হন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে। জগন্নাথ হলের খেলার মাঠের এক প্রান্তে গণকবরে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দেশের সেরা ছাত্রছাত্রী এবং বরেণ্য শিক্ষক ও গবেষকদের শ্রদ্ধার পাত্র, সবার প্রিয় মধুদা।

একাত্তরে জগন্নাথ হল ও আশপাশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহতদের স্মরণে জগন্নাথ হলে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ। এর অর্থ সংগ্রহের জন্য জগন্নাথ হলের ছাত্র ও হল কর্তৃপক্ষ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ব্লাড ব্যাংকে রক্ত বিক্রি করেছে। শহিদের রক্তঋণ কোনোভাবে শোধ করা যায় না; কিন্তু বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার জন্য যারা আত্মদান করেছেন, তাঁদের স্মরণে রাখার জন্য এ আয়োজন ভিন্নমাত্রার বৈকি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সংবাদকর্মী হিসাবে কাজ করেন, তারা কি জগন্নাথ হলের বধ্যভূমির পাশে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে 'জগন্নাথ হলের ছাত্র ও শিক্ষকদের রক্ত বিক্রি করা অর্থে নির্মিত' বাক্যটি নিয়ে কোনো প্রতিবেদন রচনা করেছেন?

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা সাংবাদিকতা করতে চান, তাদের বেশিদূর যেতে হবে না–নিবিড় গবেষণা কাজেরও তেমন প্রয়োজন পড়বে না, হাতের কাছেই যে মিলবে অনেক অনেক উপাদান।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

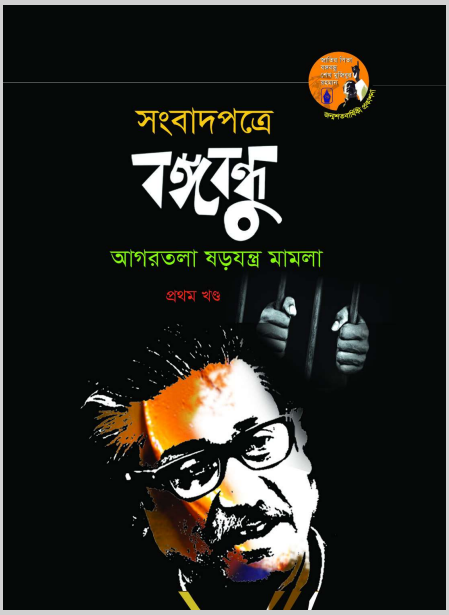

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা তথ্য সংগ্রহের নানা দিক

মোস্তফা হোসেইন

দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। সময়ের পরম্পরায় দীর্ঘ আন্দোলনকালে অসংখ্য নেতাকর্মীর সংশ্রব ঘটে এর সঙ্গে। আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে। অসংখ্য ঘটনা জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। সময়, সৈনিক এবং নেতার কর্মকাণ্ড, অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা, ফলাফল–সবই ইতিহাসের অংশ।

মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু ইতিহাস, এর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অধিকাংশই ইতিহাসের বিষয়। প্রশ্ন আসতে পারে–মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা কী? এখানে ভেবে দেখার বিষয় মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা, চলমান অতীত পরিপ্রেক্ষিত এবং এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

আমাদের জাতীয় জীবনে এর প্রভাব এত বেশি যে, মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে সংঘটিত হওয়ার পরও এর সম্পর্ক শুধু বর্তমানই নয়, ভবিষ্যতেও থাকবে। সেই সূত্রে সংবাদের সংজ্ঞায় বর্তমান ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়ার পরও মুক্তিযুদ্ধ ব্যতিক্রম। মুক্তিযুদ্ধ নিজগুণেই সর্বকালীন বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে সংবাদমূল্যের যে ধারণা কাজ করে, সেই হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টির সংবাদমূল্যও তাই চিরকালীন। সেই সুবাদে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা অত্যন্ত জরুরি।

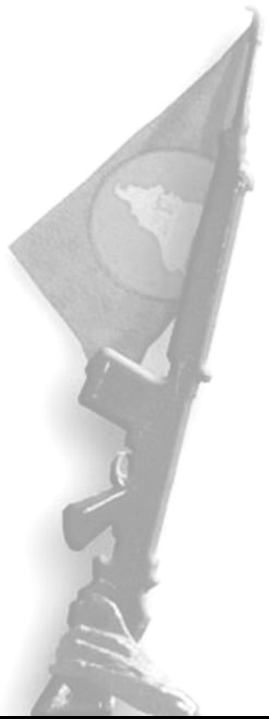

একজন সাংবাদিককে ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। সমাজবাস্তবতা বিচারে অতীতের জীবনাচার, সংস্কৃতি, জীবনবোধ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। জানা কথা–অতীতের গর্ভে বর্তমানের জন্ম আবার বর্তমানই রচনা করে ভবিষ্যৎ। সুতরাং বর্তমানচর্চায় অতীতের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর। মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আবারও উল্লেখ করতে হয়–বাঙালির আত্মপরিচয় হচ্ছে একাত্তর। সূত্র ধরে বর্তমানের অনেক সমস্যা-সম্ভাবনা কিংবা ভুলত্রুটি নির্ণয় সম্ভব। আজকের সমাজ-সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচারে আমাদের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক হিসাবে কাজ করে। আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা এলে প্রাসঙ্গিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধকে আনতে হবে।

কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিচার। একজন সংবাদকর্মী হিসাবে সংবাদ তৈরি করবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাকে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি জানতে হবে। ওই সময়ের পিরোজপুরের রাজাকারের তালিকা, স্বাধীনতালাভের পরপর থানায় এজাহার, ওই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা ভুক্তভোগী এমন বিষয়গুলো সংগত কারণেই সংবাদের অংশ হিসাবে গণ্য হতে পারে। তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনায় এটি অতি জরুরি হয়ে দাঁড়াবে। কিংবা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মামলায় নতুন চন্দ্র সিংহকে হত্যার কথা জানতে হবে। জানতে হবে চট্টগ্রামে কীভাবে হিন্দুপাড়ায় নৃশংসভাবে

মানুষ হত্যা করা হয়েছে। সেগুলো ইতিহাস বলে কি বাদ দেওয়া যাবে সংবাদ থেকে? প্রাসঙ্গিকভাবে কোনো না কোনো দিকে ইতিহাস চলে আসবে বর্তমান ঘটনার অনুষঙ্গ হিসাবে।

অতীতের গর্ভে বর্তমানের জন্ম–এই বিষয়ে অধ্যাপক পেনিলপ জে করফিল্ডের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তিনি তাঁর লেখা 'হিস্ট্রি কানেক্টস দ্য পাস্ট উইথ দ্য প্রেজেন্ট' আর্টিকেলে লিখেছেন: "Why on earth does it matter what happened long ago? The answer is that History is inescapable. It studies the past and the legacies of the past in the present. Far from being a 'dead' subject, it connects things through time and encourages its students to take a long view of such connections.

All people and peoples are living histories. To take a few obvious examples: communities speak languages that are inherited from the past. They live in societies with complex cultures, traditions and religions that have not been created on the spur of the moment. People use technologies that they have not themselves invented, So understanding the linkages between past and present is absolutely basic for a good understanding of the condition of being human. That in a nutshell, is why history matters. It is not just 'useful', it is essential."

বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের একগুচ্ছ তথ্যই সংবাদ, এমন বদ্ধমূল ধারণা সংবাদের একমাত্র পরিচয় নয়, এমনটা স্বীকার করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে অতীতের কোনো ঘটনাপ্রবাহ যদি বর্তমানের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন তার সংবাদভিত্তি থাকতে পারে। আমাদের প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতায় এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা হতে পারে।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ফসল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ পথপরিক্রমার পেছনে কাজ করেছে সুনির্দিষ্ট কিছু অঙ্গীকার ও দিকনির্দেশনা। সেই আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিচালিত। শুধু তাই নয়, আগামী দিনও তৈরি হবে সেই সূত্র ধরেই। সুতরাং সংবাদমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সার্বক্ষণিক, এটা মানতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিবেদন কিংবা নিবন্ধ রচনাবিষয়ক কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যে কোনো লেখার প্রথম শর্ত হচ্ছে লক্ষ্য ঠিক করা কিংবা পরিকল্পনা করা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে লিখতে গেলেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। পরিকল্পনাকালে সামনে আসে মুক্তিযুদ্ধের কোন দিককে নিয়ে লেখার উদ্দেশ্য। মুক্তিযুদ্ধ ঘটনা হিসাবে বিশাল। মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক যথাক্রমে:

১. পটভূমি ও ইতিহাস
২. আন্দোলন
৩. নেতৃত্ব
৪. অংশগ্রহণকারী
৫. ভুক্তভোগী, হতাহত, শরণার্থী, গণহত্যা, গণকবর ও বধ্যভূমি
৬. মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতাকারী
৭. প্রতিপক্ষ ও তাদের সহযোগী (অতীত ও বর্তমান)
৮. গণমাধ্যম ও সৃজনশীল কাজ
৯. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

এমন আরও কিছু দিক রয়েছে, যা নিবন্ধ, প্রতিবেদন কিংবা গবেষণায় প্রয়োজন হয়ে থাকে। যে কোনো দিক নিয়ে লিখতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ।

সাধারণ প্রতিবেদনের তথ্য অনুসন্ধান এবং মুক্তিযুদ্ধের তথ্য অনুসন্ধানে অধিকাংশই মিল থাকে। তবে তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে অর্ধশতাব্দীকাল আগেকার ঘটনা হওয়ার কারণে যথাযথ তথ্যপ্রাপ্তি কিংবা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই সমস্যায় পড়তে হয়। তবে তা কঠিন হলেও অসম্ভব কিছু নয়।

ক. তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে প্রথমই আমরা প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের দিকে নজর দিয়ে থাকি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমই যেতে হয় প্রত্যক্ষ ব্যক্তির কাছে। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের আগে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের যে বিষয়ে আমি লিখতে চাই, ওই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন ব্যক্তিকে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সংবাদ কিংবা বিশ্লেষণমূলক সংবাদ লিখতে গিয়ে এই সমস্যায় পড়তে হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, গণহত্যা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সেক্ষেত্রে একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি হয়তো ৫০ কিলোমিটার দূরের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, তিনিও অকপটে তার নিজ গ্রামের গণহত্যার বর্ণনা দিতে শুরু করবেন। কিংবা মুক্তিযুদ্ধকালে যিনি হয়তো এলাকায়ই ছিলেন না, তিনি তরতর করে বলতে থাকবেন নিজ এলাকার গণহত্যার বিষয়ে।
সেক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের শুরুতেই আমাকে খেয়াল করতে হবে সঠিক মানুষটিকে আমি বাছাই করেছি কি না।

খ. তথ্যদাতাদের মধ্যে বাড়িয়ে বলার প্রবণতা যেমন থাকে, তেমনই অন্যকে কৃতিত্ব না দেওয়ারও মানসিকতা থাকে। এটা মূলত হয় আমিই বেশি কাজ করেছি মুক্তিযুদ্ধে কিংবা নিজেকে সবচেয়ে বড়ো বীরত্বপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট এমনটা প্রকাশের চেষ্টা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

গ. যাচাইয়েরও যাচাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তথ্যদাতার সততা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন উত্থাপন হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক–কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সিরিজের জন্য তথ্য সংগ্রহকালে ঢাকার শহরতলি এলাকার একজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। নিজেকে তিনি গেরিলা হিসাবে পরিচয় দিলেন। দুটি পর্ব ছিল তার সাক্ষাৎকারের। প্রথম পর্বটি চমৎকার। তিনি রামপুরা টিভি সেন্টারের পাশে গ্রাম থেকে তরকারি নিয়ে এসেছিলেন বিক্রি করার জন্য। টিভি সেন্টারে থাকা আর্মির হাতে ধরা পড়েন। তরকারি বিক্রি করতে দেখে তাকে ছেড়ে দেয় পাকিস্তানি বাহিনী। তবে একটা শর্ত দেয়। পরদিন ওদের জন্য টম্যাটো নিয়ে আসতে হবে। তিনি রাজি হয়ে মুক্তি পান।
পরদিন তিনি বড়ো বড়ো টম্যাটো নিয়ে আসেন। কিন্তু সেগুলোর ভেতরে 'জামালের গোটা' গুঁড়া করে ঢুকিয়ে দেন। সেই টম্যাটো খেয়ে পাকিস্তানি সৈনিকদের ডায়রিয়া হয়ে নাজুক অবস্থা।
কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব ছিল ভারতে যাওয়া প্রশিক্ষণ গ্রহণ বিষয়ে এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ। এমন সুন্দরভাবে তিনি সব বর্ণনা করলেন, অবিশ্বাস করার মতো ছিল না। তো গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকথা যাচাই করতে গিয়ে প্রমাণ পাওয়া গেল তিনি বন্ধুদের সঙ্গে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প পর্যন্ত যাননি। ফিরে এসে বাকি সময় বাড়িতেই ছিলেন।
সুতরাং প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করলেই সব ঠিক না হওয়ার আশঙ্কাও থেকে যায়। সেক্ষেত্রে যাচাই প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য না দিলে সঠিক তথ্য না পাওয়ার ভয় থেকে যায়।

ঘ. তথ্য সংগ্রহে সমস্যা: মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহকালে কিছু বাধার মুখে পড়তে হয়। বাধাগুলো অনেক সময় আবেগপূর্ণ হয়। এ

প্রসঙ্গে কিছু মুক্তিযোদ্ধা, কিংবা ভুক্তভোগীর কথা বলতে না চাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার মতো। কিছু বলতে চান না–এমন ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

- কারও কারও মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান আছে।
- কেউ দুর্বিষহ স্মৃতিচারণ করতে চান না। এমনকি মানসিক ও শারীরিক সমস্যাও হয় কারও কারও স্মৃতিচারণ করতে গেলে।
- কারও আবার সামাজিক সমস্যাও আছে।
- কোনো কোনো তথ্যদাতার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও কাজ করে।
- দম্ভ কাজ করে কারও কারও।

অভিমান: কোনো কোনো তথ্যদাতার অবদান যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন কোনো তথ্য দিতে চান না। নিজের যুদ্ধঘটনাগুলো হয়তো যুদ্ধবিচারে অনেক উচ্চমানের। হয়তো তিনি কোনো পদক পাওয়ার মতো যুদ্ধও করেছেন। কিন্তু তাকে সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। যে জন্য তার অভিমানের কারণে তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সেই চন্দ্রবালা কি দৃশ্য বর্ণনা করতে পারেন? বাড়ির উঠোনের এক পাশে শিউলিগাছের কাছে মোড়ায় বসে মা-মাসি বলেও কোনো শব্দ শুনতে পারিনি চন্দ্রবালার কাছ থেকে। ছোটো ছেলে নিরঞ্জন এসে বসলেন মায়ের পাশে। বললেন, এ বিষয়ে কথা বললে মায়ের সমস্যা হয়। তিনি উচ্চরক্তচাপের রোগী।

বললাম, কীভাবে আমি জানতে পারি পুরো ঘটনা। তাকালাম পাশে বসা গীতার দিকে। তিনিও একদম চুপ। নিরঞ্জন বললেন, দিদি তো কথাই বলবেন না।

অথচ আমাকে যে তথ্যটা সংগ্রহ করতে হবে। বুদ্ধি বের করলাম। মাসিকে বললাম, নিরঞ্জন ঘটনাটা কিছু দেখেছে, কিছুটা আপনার কাছ থেকে শুনেছে। তার কাছ থেকে কি শুনতে পারি?

ওই মা-মাসি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। পুরো ঘটনাই বর্ণনা করলেন নিরঞ্জন। চন্দ্রবালা শাড়ির আঁচল টেনে ধরলেন চোখের ওপর। কথা চলতে থাকাকালেই মুখ ঢাকতে থাকলেন শাড়ির আঁচলে। যখন ঘটনার বিবরণ শেষ পর্যায়ে আসতে শুরু করে, চন্দ্রবালার মুখ পুরোই ঢেকে যায় সাদা কাপড়ে।

> বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ফসল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ পথপরিক্রমার পেছনে কাজ করেছে সুনির্দিষ্ট কিছু অঙ্গীকার ও দিকনির্দেশনা। সেই আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিচালিত। শুধু তাই নয়, আগামী দিনও তৈরি হবে সেই সূত্র ধরেই। সুতরাং সংবাদমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সার্বক্ষণিক, এটা মানতে হবে

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা: একাত্তর এই দেশের মানুষকে নৃশংসতা দেখিয়েছে। স্বজনহারানোর সময় ছিল সেটা। পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা এতই বেশি ছিল, যা মনে এলে কেউ কেউ সহ্য করতে পারেন না। পুনর্ব্যক্ত করতে গেলে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে শারীরিক নানা সমস্যাও তৈরি হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে: 'স্বামীর কর্তিত মাথা রাখে স্ত্রীর মাথায়: ঘটনাস্থল চট্টগ্রাম। শহর থেকে মোটরসাইকেলে ৪০-৪৫ মিনিট লাগে। জায়গার নাম এবং চরিত্রগুলোর সঠিক নাম উল্লেখ থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে অনিবার্য কারণে। চট্টগ্রামের একজন লেখক ও নাট্যকর্মীকে নিয়ে যাই দত্তপাড়ায়। উদ্দেশ্য একজন নারীর সাক্ষাৎকার। যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ৪৬ জন মানুষকে রামদা, তলোয়ারজাতীয় দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে খুন হতে। সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে–৪৬তম মানুষটি ছিলেন ওই মহিলার স্বামী। ঘাতককে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, দেখ পুরো পাড়াকে পুরুষশূন্য করেছ। দয়া করে আমার স্বামীকে হত্যা করো না। ঘাতকরা তার কথা শুনেনি। শুধু তাই নয়, চন্দ্রবালার স্বামীর মাথাটিও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধারালো রামদার আঘাতে। আর্তনাদ করে ওঠেন চন্দ্রবালা। এর পর? স্বামীর কর্তিত মাথাটি চুল ধরে ঘাতকটি নিয়ে আসে চন্দ্রবালার কাছে। লেপটে ধরে স্ত্রীর মাথায়।

নিরঞ্জন যখন বলতে থাকে, আমার বাবার দেহবিচ্ছিন্ন মাথাটা জল্লাদটা আমার মায়ের মাথায় এনে রাখে। আমার মা তখন বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। উঠোনটার ওই কোনায়।

এটুকু শোনার পর দেখি গীতা ছটফট করছে। নিরঞ্জনের চোখ ভিজে গেছে। আমি মাইক্রো ক্যাসেট অন করে নির্বাক হয়ে যাই। নিরঞ্জন কাঁদতে শুরু করে। আর গীতা আস্তে করে জলচৌকি ছেড়ে ঘরের দিকে চলে যায়। একাত্তরে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া সেই কিশোরীর কি হয়েছিল একাত্তরের ওইদিন? সবকিছু জানানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কী শুনছি? নিরঞ্জনের হাত প্রসারিত। দেখিয়ে দিচ্ছে, ওই জায়গায় ছিল ছোটো একটা জঙ্গল। সেখানে লুকিয়ে ছিলেন গীতা দি। সবই দেখছিলেন তিনি। মাকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের ইজ্জতের ভয় দূরে ঠেলে দিয়ে জঙ্গল থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে আসেন। জড়িয়ে ধরেন মাকে। ততক্ষণে ৪৬টি কর্তিত দেহ একটা মাটির ঘরে ঢুকিয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে জল্লাদরা। দাউ দাউ করে জ্বলছে ঘরটা। আর জল্লাদদের একজন এসে গীতাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় ওই ঘরের দিকে। ধাক্কা দিয়ে আগুনে ফেলে

দেয়। প্রায় বৃদ্ধ এক জল্লাদ আবার টেনে আনে গীতাকে। মা ও মেয়ে তখন পাশাপাশি মাটিতে পড়ে আছে। দিদি...।

আমার শোনা দরকার, রেকর্ড করা দরকার; কিন্তু মনে হচ্ছিল এই একটি শব্দ আমাকে হাজারটা বোমার আঘাত করছে। মুখ নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে থাকি। একসময় থেমে যায় নিরঞ্জনের কণ্ঠ।

তারপর ওই দুপুরে পিনপতন নীরবতা গ্রাস করে। আমার হাতের ক্যাসেটটি বাতাসের শব্দ রেকর্ড করে চলে।

এদিকে ফিরতে হবে আমায়। শহরে ফেরার পথে মোটরসাইকেলে বসে যখনই সামনে তাকিয়েছি, আমার মনে হয়েছে এক শহিদজায়ার সাদা শাড়ি এসে আমার চোখ ঢেকে দিচ্ছে। কিছুই দেখছি না আর।' (বাংলাদেশের জনযুদ্ধ ভূমিকা, মোস্তফা হোসেইন, প্রকাশক: ভিরাসাত আর্ট পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ভারত)

তথ্য সংগ্রহের দৃশ্যগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্য মূলত তথ্য সংগ্রহকালে সংগ্রাহকের আবেগকে প্রকাশের জন্য। সেখান থেকে বোঝা যেতে পারে, একজন তথ্যসংগ্রাহক কোন কারণে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ করতে চান।

সামাজিক সমস্যা

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে ২ লাখের বেশি মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। সর্বস্বত্যাগী নারীদের প্রাপ্য সম্মান দিতে আমাদের ৪৫ বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তারা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সম্মানিত হন। ফলে স্বল্পসংখ্যক নারী এগিয়ে আসেন একাত্তরের নৃশংসতার তথ্য দেওয়ার জন্য। নির্যাতিত নারীদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে মারা গেছেন। জীবিতদের অধিকাংশই আজও মুখ খুলতে নারাজ। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়: ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার একটি গ্রামে তথ্য সংগ্রহকালে জানা যায়, ওই গ্রামে আটজন নারী নির্যাতিত হয়েছেন। দুজন জানালেন নৃশংসতার কথা। তাদের একজনের কাছে বাকিদের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন, তারা ওয়াদাবদ্ধ অন্যদের নাম প্রকাশ না করতে। কারণ ওই নির্যাতিত নারীদের পরিবার-সন্তানরা চান না তাদের মা-দাদির দুর্বিষহ কথাগুলো প্রকাশ হোক।

সামাজিক কারণে মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতধর্মী তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। আমি নিজে বেশকিছু জায়গায় শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করি। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছি মাত্র একজনের। কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার সদর রসুলপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস তার নাম। কিছু না জানিয়ে উপস্থিত হলেও তারা কোনো না কোনো উপায়ে সটকে পড়েন। ওইসব স্বাধীনতাবিরোধীর সন্তান কিংবা পরিবারের সদস্যরাও চান না তাদের বাবা কিংবা পরিবারপ্রধানের একাত্তরের কৃতকর্মের কথা নথিভুক্ত কিংবা গ্রন্থভুক্ত হোক।

প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা

তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদাতা মনে করেন, তথ্য সংগ্রহ করে অনেক টাকাপয়সার মালিক হয়ে যাবে। সুতরাং সেই টাকার হকদার তিনিও। এমনও দেখা গেছে, সাক্ষাৎকার দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ চাওয়া হয়। এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে এই লেখকেরও। তাদের স্পষ্ট কথা–আপনি সরকার থেকে বড়ো অঙ্কের টাকা পাবেন, আমাকে দেবেন না কেন? সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতাকে বোঝাতে কৌশলের অবলম্বন করতে হয়।

বিভ্রান্তিমূলক মনে হলেও ঠিক

সাধারণ সংবাদের তথ্য সংগ্রহের চেয়ে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়:

"মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহকালে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে মৌখিক তথ্যগুলো নিয়ে মতভেদ। কোনো এলাকায় গেলে প্রথম যে বাক্যটি শুনতে হবে–সব ভুয়া। সবাই নিজের কথা বলে। কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন পুরো যুদ্ধটাই যেন তিনি একাই করে ফেলেছেন। হয়তো রাইফেল কাঁধে করে ঘুরেছেন–এখন তিনি বর্ণনা করবেন বিশাল বীর যেন। আর নিজের বীরত্ব দেখাতে গিয়ে সত্য-মিথ্যা গল্প বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে গল্প-উপন্যাসে পরিণত করবেন। সব ভুয়া। আবার একই মুখ থেকে হয়তো শোনা যাবে–আরে ভাই ৫০ ভাগই মিথ্যা-বানোয়াট। কী করবেন এসব মিথ্যা তথ্য সংগ্রহ করে?

মাঠপর্যায়ে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে যখন এমন নেতিবাচক বক্তব্য আসবে, তখন কোনো তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারীর ভূমিকা কী হবে? নাকি তথ্যদাতাদের মিথ্যুক ভেবে তিনিও সংগ্রহ থেকে বিরত থাকবেন? তথ্যবিভ্রাটবিষয়ক বিতর্কের দু-একটি উদাহরণ দিই:

নরসিংদীর মনোহরদী উচ্চবিদ্যালয়ে বড়ো একটা যুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে অংশগ্রহণকারী কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধস্মৃতি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম মনোহরদী। পরিশ্রম কমানোর জন্য মনোহরদী থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও স্থানীয় একজন তথ্য সংগ্রাহককে অনুরোধ করেছিলাম, মনোহরদী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে অংশগ্রহণকারী ৫/৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে যেন ডাকা হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সামনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি সংশ্লিষ্টদের একজনের। ভাবলাম হয়তো যাচাই না করলেও চলবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের অনুরোধ করি, স্মৃতিচারণকারী যদি কিছু ভুলে যান কিংবা ভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন, তাহলে তারা যেন সঠিক তথ্যদানে সহযোগিতা করেন। সাক্ষাৎকারদানকারী স্মৃতিচারণকালে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন কয়েকবার তথ্য সংশোধন করেন। একাধিকবার তাদের মধ্যে তর্কবিতর্কও হয়। একটি তথ্য বিষয়ে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা একমত হতে না পারায় একজনকে টেলিফোন করে সেটা সংশোধনও করা হয়। এমন অবস্থায় সেই তথ্যকে যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করিনি।

লেখাটি শেষ করার পর মনে হলো ওই এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধা আমার সহকর্মী। একই পত্রিকায়, একই বিভাগে কাজ করি। শুধু তাই নয়, তিনিও সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ভাবলাম, তাকে দেখিয়ে নিই। সেই অনুযায়ী লেখাটা সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য দিই আমার সহকর্মী সেই মুক্তিযোদ্ধাকে। তিনি পড়লেন লেখাটা। এরপর পুরো পৃষ্ঠায় লিখে দিলেন সর্বৈব মিথ্যা। স্বাভাবিকভাবে মন খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। একবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে বাধা পড়ল। আবার ফোন করলাম তথ্যদাতাকে এবং সেই এলাকার মুক্তিযোদ্ধা উপজেলা কাউন্সিলের কমান্ডারকে। তারা বললেন, আমাদের এতগুলো মানুষের বক্তব্যকে যদি আপনি ভুল মনে করেন তাইলে আমাদের কিছু করার নেই।

আপনি যা ভালো মনে করেন, সেটা আপনার বিবেচনা অনুযায়ী করে নিন। তবে জেনে রাখেন, আমার স্মৃতিচারণ হিসাবে যদি সেটা প্রকাশ করেন, তাহলে এতগুলো মুক্তিযোদ্ধার সমর্থনসহ আমি যা বলেছি তাই ছাপতে হবে। কে কী বলল, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।

তাহলে পরিণতিটা কী দাঁড়াল। যে লেখাটি প্রকাশিত হলো, তা অধিকাংশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন হলেও এর বিপক্ষে মন্তব্যকারী

কিন্তু ঠিকই রয়ে গেছেন। এই মনোহরদী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের যুদ্ধের স্মৃতিচারণা আমার সহকর্মীও লিখিতভাবে করেছেন। তার যুদ্ধস্মৃতি নিয়ে বই প্রকাশের ব্যাপারে আমিও তাকে দীর্ঘদিন তাগাদা দিয়ে আসছি। সেই লেখায় নিশ্চিত তার বক্তব্যই প্রকাশ করবেন। এরপর কেউ যদি মনোহরদীর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে।

সবই কি ভুল

তথ্য যাচাইয়ে এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হয় প্রায়ই। নিজের গ্রামের কথাই বলি। একাত্তরের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লা জেলার তৎকালীন বুড়িচং থানার চান্দলা গ্রামের মাওলানা আব্দুল লতিফের বাড়িতে ঢোকে। মাওলানা সাহেবসহ পাঁচজনকে গরুর দড়িতে বেঁধে নৃশংসভাবে খুন করে। ইতোমধ্যে মাওলানা সাহেবের বাড়ির তিনদিকে ঘিরে ফেলে মুক্তিবাহিনী। মূলত আক্রমণের নেতৃত্বে ছিল চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সুবেদার আব্দুল ওয়াহাব ছিলেন সরাসরি মাঠের নেতৃত্বে। ক্যাপ্টেন গাফফার ছিলেন কাভারিংয়ে।

মাওলানা সাহেবের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে দর্পনারায়ণপুর গ্রামে ছিল নাজমুল হাসান পাখির নেতৃত্বাধীন বিএলএফ-এর একটি গ্রুপ। যেখানে যুক্ত হয়ে পড়েন বেঙ্গল রেজিমেন্টের আমীর খানসহ কয়েকজন। মাওলানা সাহেবের বাড়ির দক্ষিণে আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়িতে মুজিববাহিনীর আমরা কয়েকজন ছিলাম বেঙ্গলের হাবিলদার মুসলেমের নেতৃত্বে। ভূঁইয়াবাড়িতে ছিলেন সুবেদার আব্দুল ওহাব থ্রি ইঞ্চি মর্টারসহ।

এভাবে উত্তর চান্দলা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী অবস্থান নেয়। ফলে মাওলানা সাহেবদের বাড়ির তিনদিকে মুক্তিবাহিনী অনেকটা ইংরেজি ইউ টাইপে অবস্থান নেয়। উত্তর চান্দলা থেকে দর্পনারায়ণপুর পর্যন্ত দূরত্ব মাপলে অন্তত তিন কিলোমিটার হবে। উত্তর চান্দলার সঙ্গে দক্ষিণ চান্দলা কিংবা দর্পনারায়ণপুরে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের কারও সঙ্গে কারও কোনো যোগাযোগ ছিল না। ছিল না যুদ্ধকালীন সিগন্যালিং ব্যবস্থাও। টেলিফোনের তো প্রশ্নই আসে না। ফলে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে উত্তর চান্দলায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধটা যেভাবে দেখেছেন, দর্পনারায়ণপুর কিংবা দক্ষিণ চান্দলায় অবস্থানরতদের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হওয়াই স্বাভাবিক। এই ভিন্নতাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যবিভ্রাটে ফেলে। আমার দেখা সেই যুদ্ধের ঘটনা লিখতে গিয়ে নিজেও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই কঠিন। একজন অংশগ্রহণকারী সহজে এবং জোরালোভাবেই অন্য অংশগ্রহণকারীর দেওয়া তথ্যকে চ্যালেঞ্জও করতে পারছেন। যেমনটা নরসিংদীর মনোহরদীর যুদ্ধ নিয়ে 'সর্বৈব মিথ্যা' বলেছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। এমনটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সেক্ষেত্রে যার যার দেখাটাই সত্য ভাবেন, অন্যের দেওয়া তথ্যকে বলেন মিথ্যা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এমন অবস্থায় সবার তথ্যই সঠিক, (সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে)।

ওরাল হিস্ট্রি সংগ্রহে ভুলভ্রান্তি থেকেই যেতে পারে। যেমন একজন তার পরিচয় দিলেন কালু মিয়া হিসাবে, রেকর্ড বাজিয়ে শোনার সময় কানে বাজল মালু মিয়া। সেক্ষেত্রে লেখায় ভুল হয়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য তাই আমার লেখা মুক্তিযুদ্ধের বইগুলোয় সব সময় পাঠককে অনুরোধ করি, এ ধরনের ভুল কারও চোখে পড়লে যেন কষ্ট করে আমাকে জানান। এমন কিছু ভুল সংশোধনের সুযোগ হয়েছে আমার।"

> আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বহুমাত্রিক একটি জনযুদ্ধ। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার কারণে এই যুদ্ধে প্রথাগত অস্ত্র যেমন ছিল, তেমনই একবারেই সাধারণ কৃষকের গৃহস্থালি যন্ত্রপাতিও যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। এই যোদ্ধাদের মন-মানসিকতা, তাদের জানার পরিধি ও পরিবেশ বিভিন্নরকম। তাই পরিকল্পনা গ্রহণকালে সেসব বিষয় মাথায় রেখে করা প্রয়োজন

(বাংলাদেশের জনযুদ্ধ, ভূমিকা, মোস্তফা হোসেইন, ভিরাসাত আর্ট পাবলিকেশন্স, কলকাতা)

দাম্ভিকতা: সপ্তাহকাল আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন, আজ চলে যান।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যুদ্ধে অবদানও আছে, লেখার জন্য তার তথ্য প্রয়োজন–এমন কারও কাছে যাওয়ার পর প্রত্যাখ্যাতও হতে হয়। সেক্ষেত্রে লেখার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তি বিঘ্ন ঘটে। নিজের অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা গেল।

'কুমিল্লায় গিয়েছি যুদ্ধের প্রস্তুতির তথ্য সংগ্রহে। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে। সময় দিলেন, সন্ধ্যা ৬টায় তিনি কথা বলবেন। তার রাজনৈতিক অফিসে সময়ের আগে গিয়ে হাজির হলাম। কতক্ষণের মধ্যে কামরা ভরে গেছে প্রায়। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে তিনি তাদের অনেককেই ভালোবাসার প্রকাশ করছেন। প্রায় ঘণ্টা পেরিয়ে যায়, তিনি গালাগাল করেই চলেছেন আগুন্তুকদের সঙ্গে। বুঝলাম এটাই তার স্টাইল। অতঃপর বললাম, আমাকে কি একটু সময় দেওয়া যাবে? জবাব পাওয়া গেল–আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে এক সপ্তাহ আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে হয়। ঠিকই তো আমি তো

সাতদিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিইনি। খিস্তিখেউড় বন্ধ করে আমার সঙ্গে তিনি কথা বলেন কীভাবে?

ঢাকাগামী বাস বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। বাধ্য হয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী বাস ধরার জন্য শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে হাইওয়েতে যেতে হলো আমাকে।

এর কয়েক মাস পর সেখানকারই আরেক জাঁদরেল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ঢাকা থেকে গেলাম নির্ধারিত সময়ে জজকোর্টে। জানলাম তিনি কোর্টে যান কম। ফোন দেওয়ার পর বললেন, তিনি আছেন উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিসে। অনুমতি চাইলাম চলে আসব কি না। বললেন, বিকাল সাড়ে ৪টায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিসে যেতে। সাড়ে ৪টায় সেখানে গিয়ে পাওয়া গেল না তাকে। ফোন দেওয়ার পর তিনি জানালেন, ব্যস্ততার কারণে জেলা পরিষদ ভবনে যেতে পারেননি। আরেকবার যোগাযোগ করে যেন আমি কুমিল্লা যাই। তাই আজও কুমিল্লা জেলায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে লেখাটা শেষ হলো না।'

অজ্ঞতা: তিনি কি মুক্তিযোদ্ধা?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত ব্যতিক্রমধর্মী জনযুদ্ধ। বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এর বিস্তৃতি ছিল বিশাল। গৃহিণী থেকে শুরু করে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য–সব পেশার মানুষ ছিলেন একেকজন মুক্তিযোদ্ধা। লক্ষণীয়, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পরও অনেকেই জানেন না তিনি যোদ্ধা। রাষ্ট্রীয়ভাবেও তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ীও হয়তো কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার হতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজেই জানেন না তিনি মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার যোগ্য। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

'একাত্তরে হাফানিয়া যুবশিবিরে মসজিদের ইমামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট আছে কি না। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, তিনি কি মুক্তিযোদ্ধা নাকি যে তার সার্টিফিকেট থাকবে? একই জবাব পেয়েছি কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার বড়ধুশিয়া গ্রামের আব্দুল হালিমের কাছ থেকেও। তিনি যুদ্ধে পুরো সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গেছেন গুলির বোঝা বয়ে। একটি পা-ও হারিয়েছেন মাইন বিস্ফোরণে। তাঁর কথা–তিনি তো অস্ত্র চালাননি। তিনি মুক্তিযোদ্ধা হবেন কেন? (অবশ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কথা নয় তার। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি)

আর নড়াইলের মুক্তিযোদ্ধা গোলাম আজাদ বীরপ্রতীকের মা রাবেয়া খাতুন নিজের বাড়িতে ১০০ মুক্তিযোদ্ধাকে ৫/৬ মাস রেখেছেন। নিজ হাতে রান্না করে খাইয়েছেন। যাদের মধ্যে তার দুই ছেলে ও বোনের ছেলেও ছিল। এক ছেলে বীরপ্রতীক খেতাবও পেয়েছেন। সেই দেশপ্রেমিক নারী জীবদ্দশায় একবারও বলেননি তিনিও মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেন। তার ছেলেরা আজও দাবি করেননি তাদের মা তো মুক্তিযোদ্ধা। যাক এটা অন্য প্রসঙ্গ।

তথ্য সংগ্রহকালে কিছু মজার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করতে হয়। ঢাকার ভাটারা এলাকার একজন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে দাবি করেন। তার সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়। খুব সুন্দর করে তিনি বর্ণনা করেন কীভাবে আগরতলা গিয়েছেন, কীভাবে ট্রেনিং নিয়েছেন প্রভৃতি। কথিত সহযোদ্ধাদের একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আদৌ তিনি যুদ্ধেই যাননি। সার্টিফিকেটের তো প্রশ্নই আসে না। তবে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তাদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনে সব নিজের সঙ্গে মিলিয়ে তথ্য দিয়ে দিলেন।'

মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহকালে এমন নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। কৌশলে কারও কাছ থেকে হয়তো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কারওর কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে সব ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল করা প্রয়োজন, তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনাকালে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বহুমাত্রিক একটি জনযুদ্ধ। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার কারণে এই যুদ্ধে প্রথাগত অস্ত্র যেমন ছিল, তেমনই একবারেই সাধারণ কৃষকের গৃহস্থালি যন্ত্রপাতিও যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। এই যোদ্ধাদের মন-মানসিকতা, তাদের জানার পরিধি ও পরিবেশ বিভিন্নরকম। তাই পরিকল্পনা গ্রহণকালে সেসব বিষয় মাথায় রেখে করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ

মাধ্যমিক তথ্য হচ্ছে যা প্রাথমিক তথ্য হিসাবে অন্য কেউ আগে প্রকাশ করেছে বা ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ এই তথ্য আগে প্রকাশিত কিংবা প্রচারিত হয়ে থাকে।

অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় আগে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে লেখার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্যের সহযোগিতা নিতে হয়। অর্ধশতাব্দীকালে অসংখ্য প্রাথমিক তথ্য বই আকারে, আর্টিকেল হিসাবে কিংবা সংবাদ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে অসংখ্য বই, চিত্র, তথ্যচিত্র, ছবি, হাজার হাজার আর্টিকেলের ওপর নির্ভর করতে হয়। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সংবাদ কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণ লিখলে কিছু বিষয় মেনে নিতে হয়। কারণ যে বই কিংবা আর্টিকেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলো, সেটি হয়তো প্রাথমিক তথ্য এবং মাধ্যমিক তথ্যের সংমিশ্রণ কিংবা মাধ্যমিক তথ্যও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহলে সেটি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ ধাপেরও হয়ে যেতে পারে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের বিকল্প থাকে খুবই কম। ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা যেমন গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে পার্লামেন্টে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ কিংবা এতৎসংক্রান্ত কোনো সংবাদ। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের বিকল্প নেই।

মুক্তিযুদ্ধের লেখা তৈরির ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের অনেক সুবিধা যেমন আছে, তেমনই তার কিছু সমস্যাও আছে। সমস্যা হচ্ছে–মুদ্রিত তথ্যসমগ্রে ভিন্নতা। যুদ্ধকালে সংগ্রহ করা তথ্য খুবই সামান্য। পরবর্তীকালে দলিলাদি থেকে তৈরি করা গ্রন্থ কিংবা আর্টিকেলে অনেক সময় একই বিষয়ে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে দিন তারিখ, নেতৃত্ব যুদ্ধঘটনা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

কিছু বিভ্রান্ত তৈরি করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের অভিপ্রায়ে। এসব বিতর্ক তৈরির পেছনে মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার উদ্দেশ্যও কাজ করেছে। উদাহরণ হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলা যায়। বিশ্বব্যাপী মানুষ জানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত দ্বিপ্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, যা ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বিশ্বের অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই বিষয়ে যুদ্ধকালেই সংবাদ প্রকাশ হয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনেরও ২০/২৫ বছর পর দেখা গেল বিভিন্ন লেখায় তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, যা জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায়ও তিনি বলেননি কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি–এমনটাও তিনি বলেননি। কিন্তু জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তার দলের পক্ষ

থেকে এই বিতর্ক তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একাত্তরের মার্চে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে কর্মরত এবং স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠগুলো সম্প্রচারে নিয়োজিত কর্মীদের নিজেদের বয়ান আমলে আনতে পারি। কালুরঘাটে অবস্থিত রেডিয়ো পাকিস্তান চট্টগ্রাম সম্প্রচার কেন্দ্রের নাম হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে সিনিয়র অনুষ্ঠান সংগঠক হিসাবে কর্মরত ছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, '...এমনি হতাশার মধ্যে ২৬ মার্চ অপরাহ্ণে প্রায় দুইটার সময় তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এলো একটি বিদ্রোহী কণ্ঠ। প্রায় ৫ মিনিটকাল স্থায়ী এই কণ্ঠে ছিল বাংলার জনগণের প্রতি দখলদার বাহিনীকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান। এই দুঃসাহসী বীর কণ্ঠ ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মরহুম জনাব আব্দুল হান্নান। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই থেমে গিয়েছিলে সে কণ্ঠ।'

শামসুল হুদা চৌধুরী তার একই লেখায় উল্লেখ করেন, '... হঠাৎ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আরেকটি কণ্ঠ ইথার ভেদ করে বেরিয়ে এলো।...বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি–এজাতীয় কথা কটি কয়েকবার প্রচার করে শ্রোতাসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করলেন চট্টগ্রাম বেতারের বর্ষীয়ান গীতিকার এবং কবি আব্দুল সালাম। অতঃপর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী পড়ে শোনালেন জনাব আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। উল্লেখ্য, এই বাণী ছিল পূর্বাহ্নে চট্টগ্রামে বিলীকৃত হ্যান্ডবিলটির বঙ্গানুবাদ।' শামসুল হুদা চৌধুরীর লেখার প্রথম অংশেই উল্লেখ করা হয়–১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেই মেজর জিয়াউর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী।' (একাত্তরে রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃ. ১৬১-১৭৩, আহমদ পাবলিশিং হাউজ)

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শব্দসৈনিক বেলাল মোহাম্মদ 'শোনেন বলি নতুন করে পুরান ঘটনা' শিরোনামের লেখায় উল্লেখ করেন, '২৬ মার্চ প্রত্যুষে চট্টগ্রাম শহরের প্রধান প্রধান সড়কের চলমান মাইকে ঘোষণা করা হয় : ভাইসব আমাদের মহান নেতা বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। জয় বাংলা।

দুপুরে হাতে পাই একটি খুদে লিফলেট ডা. আনোয়ার আলীর স্টেনসিলে টানা হাতের লেখা গেসটেটনার মেশিনে মুদ্রিত। বঙ্গবন্ধুর জবানিতে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা। ওই সময়ে চট্টগ্রামে চাউর হয়েছিল যে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গভীর রাতে অতর্কিত হানা দেয় পাকিস্তানি সৈন্যরা। বহু মানুষ হতাহত। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি ওয়্যারলেস মাধ্যমে চট্টগ্রামে নেতারা পেয়েছেন। সেই মেসেজের বঙ্গানুবাদই ছিল ওই লিফলেট।

২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমাদের বিভিন্ন কণ্ঠে বারবার সেই ঘোষণাই প্রচারিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন মন্ত্রগুপ্তির স্বার্থে ঘোষকদের নাম প্রচার করা হয়নি। সেই অধিবেশনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার আলোকে জনগণের উদ্দেশে লিখিত বক্তব্য প্রচার করেন স্বকণ্ঠে। বর্ষীয়ান কবি আব্দুস সালামও ভাষণ দেন।...জিয়াকে ২৭ মার্চ ব্যক্তিগতভাবে পটিয়া গিয়ে আমিই কালুরঘাটে নিয়ে এসেছিলাম তার দেড়শজন সিপাহিসহ। তারা কালুরঘাট প্রচার ভবনের সার্বক্ষণিক প্রহরায় মোতায়েন হন।' (স্বাধীন বাংলা বেতারের ইতিহাস, সম্পাদনা: ড. জাহিদ হোসেন প্রধান, কলকাতা)

মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় এমন বিতর্কিত বিষয়গুলোর মুখোমুখিও হতে হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাকে বিতর্কিত করার বিষয়টি একটি উদাহরণমাত্র। এমন তথ্যবিকৃতির উদাহরণ আরও আছে, যা তথ্যসংগ্রাহককে মাঝেমধ্যে বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে।

> মুক্তিযুদ্ধের লেখা তৈরির ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের অনেক সুবিধা যেমন আছে, তেমনই তার কিছু সমস্যাও আছে। সমস্যা হচ্ছে–মুদ্রিত তথ্যসমগ্রে ভিন্নতা। যুদ্ধকালে সংগ্রহ করা তথ্য খুবই সামান্য। পরবর্তীকালে দলিলাদি থেকে তৈরি করা গ্রন্থ কিংবা আর্টিকেলে অনেক সময় একই বিষয়ে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়

মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহকালে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহকালে নিম্নে উল্লেখ্য সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

- মাধ্যমিক তথ্যভান্ডারের তথ্যগুলো সংগ্রহের উদ্দেশ্য।
- অনুসন্ধানের এলাকা।
- তথ্যের কার্যকারিতা।
- মাধ্যমিক তথ্যভান্ডারে গৃহীত প্রাথমিক তথ্যগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা।

তথ্য সংগ্রহকালে কোন বিষয়ে, কী বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সংবাদ কিংবা নিবন্ধ লেখা হবে, তা আগেই নির্ধারণ করতে হবে। ধরা যাক, আমি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার একাত্তরের বীরাঙ্গনাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লেখা। অর্থাৎ আমি কী কাজ করব, তা নির্ধারণ হয়ে গেল। সম্ভাব্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে চিন্তা হলো–ওখানকার বীরাঙ্গনা, নির্যাতিত মানুষ, ভুক্তভোগীর খোঁজ করা। প্রাথমিক তথ্য লেখার চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তখন বাধ্য হয়ে মাধ্যমিক

তথ্যের দিকে যেতে হবে। মৌলভীবাজার জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে বই এবং পত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ ও আর্টিকেলও সংগ্রহ করা হলো। সংগ্রহ করা বইয়ে দেখা গেল মৌলভীবাজার জেলায় পরিচালিত গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বীরাঙ্গনাদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সেই তথ্য পূর্ণাঙ্গ হবে না।

আরেকটি তথ্য হয়তো বীরাঙ্গনাদের বিষয়ে আধিক্য আছে। কিন্তু সেখানে এমন পরিসংখ্যান দেওয়া আছে, যেখানে আশির দশকে বীরাঙ্গনাদের অবস্থা উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই। কারণ বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল বীরাঙ্গনাদের দুর্ভোগ সম্পর্কে তথ্য সংযোগ। সেক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাদের বিষয়টি বিস্তারিত সেখানে নেই। কারণ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল সেরকম। সুতরাং মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহকালে বইয়ের বা আর্টিকেলে উপস্থাপিত তথ্যগুলো কোন উদ্দেশে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেদিকটি খেয়াল করতে হবে।

একইভাবে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহকালে অনুসন্ধানের এলাকার দিকে নজর দিতে হবে। যেসব তথ্য-উপাত্ত বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে এর কার্যকারিতার বিষয়ও খেয়াল করতে হবে। একইভাবে মাধ্যমিক তথ্যে যেসব প্রাথমিক তথ্য রয়েছে, সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এখন তথ্য যদি এমন কোনো সূত্র থেকে নেওয়া হয়, যা ইতিহাসের বিপরীতমুখী হয়, তাহলে যে কাজটি করা হবে, সেটিও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

তারপরও বলা দরকার, দুর্নীতি কিংবা অন্য আরও তথ্য সংগ্রহে যেমন প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়, মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহে সেই তুলনায় খুবই কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্টদের অনেকেই এখনো জীবিত আছেন। তাদের নিজের অভিজ্ঞতা যেমন তারা বলতে পারেন, তেমনই মাধ্যমিক তথ্য যাচাইয়েরও সুযোগ একটু বেশিই আছে। যুদ্ধকালীন দলিলদস্তাবেজও পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়। ছয় হাজারের বেশি শিরোনামের বই প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর। এখনো অব্যাহত আছে বই প্রকাশ। তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে–এই বিষয়ে সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ কিংবা প্রণোদনার ঘাটতি আছে। বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের দেশ বানাতে হলে তথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হলে মুক্তিযুদ্ধকে জানতে হবে এবং জানাতে হবে আজকের ও ভবিষ্যতের প্রজন্মকে।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

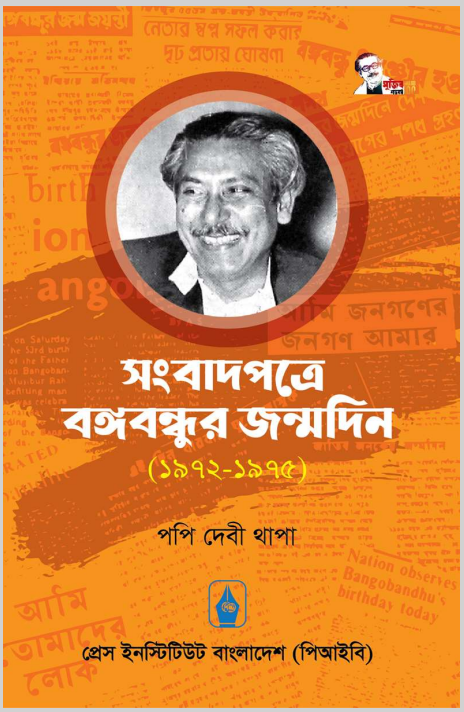

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা

নাদীম কাদির

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। সাংবাদিকতা একটি পবিত্র পেশা। আমি সাংবাদিক হয়েছি এ পেশাকে ভালোবেসে। সাংবাদিকতা পেশাকে ভালো না বাসলে ভালো কাজগুলো হবে না। আর এর সঙ্গে থাকতে হবে দেশপ্রেম।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং আমরা ৫১ বছর স্বাধীন দেশে বসবাস করছি। আমি আনন্দিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এমনই একটি বিষয় বেছে নিয়েছে তাদের গণমাধ্যম সাময়িকী 'নিরীক্ষা'-এর জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর রিপোর্টিং শেষ হওয়ার না; কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। হয়তো যুদ্ধ শেষ আর আমরা ৫১ বছর পার করলাম স্বাধীন দেশ হিসাবে। সত্যি এ এক বড়ো অর্জন।

প্রথমত বলতে হবে, ১৯৭৫-এর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর জাতির পিতার নাম ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মুছে ফেলে নতুন-নতুন কাহিনি পেশ করা হয়। সংবাদপত্র ব্যর্থ হয়েছে মিথ্যা ছাপানো থেকে বিরত থাকতে। এই সময় এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বিভিন্ন কারণে। সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো–বহু সাংবাদিক জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকারকে তুষ্ট করতে ব্যস্ত ছিলেন। জীবনের ভয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন অনেকেই অথবা হুকুমের গোলামে পরিণত হন।

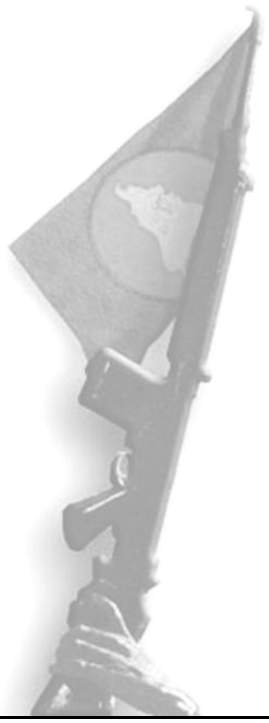

১৯৭৫ থেকে ২০২২–লম্বা ৪৭ বছর। এর মধ্যে ১৫ বছর সামরিক একনায়কতন্ত্র। এরপর ১৯৯১-১৯৯৬ ও ২০০১-২০০৬ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ঘাড়ে চেপে জামায়াতে ইসলামীর মতো যুদ্ধাপরাধীদের দল ক্ষমতায় এলো। আমি ২০২০ ও ২০২১ সালে দেশের বেশকিছু গ্রাম ও শহর ঘুরেছি। এটাও সাংবাদিকতার একটি অঙ্গ। শুনলে অবাক হবেন অনেক ছাত্র-ছাত্রী ঠিকমতো বলতে পারেনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে। তারা দ্বিধান্বিত কোনটা বিজয় দিবস আর কোনটা স্বাধীনতা দিবস। অত্যন্ত লজ্জা ও কষ্টের ব্যাপার। মাত্র ৫১ বছরেই এই অবস্থা হলে সামনের দিনগুলোয় আমাদের গর্বের ইতিহাস বা অর্জন কি হারিয়ে যাবে? তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রিপোর্ট ও ফিচার লেখার ওপর জোর দিতে হবে। প্রয়োজনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয় নিয়ে যেসব লেখা বা রিপোর্ট, তা নিয়ে ভালো গ্রন্থ প্রকাশ এবং ভালো নাটক ও সিনেমা তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের সাংবাদিকদের দায়িত্ব এ বিষয়ে সোর্স হিসাবে কাজ করা। এই সুযোগে আমি জানাতে চাই, আমার অভিজ্ঞতার আলোকে দুইটি বই প্রকাশ হয়েছে এই মার্চ মাসে। একটি হলো 'Half Widow.... A Woman and the Bangladesh War' (Rubric Publication, New Delhi) এবং 'মুক্তিযুদ্ধ: অজানা অধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ' (জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা)।

পরবর্তী সময়ে বড়ো অর্জন হলো 'রক্তধারা ৭১' নামে একটি সংগঠন করেছি। বয়স দুই বছর। আমরা এই সংগঠনে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের উত্তরসূরিদের সদস্য করেছি যেন যুগযুগ থেকে

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও তাদের পরিবারের জন্য কাজ করা। এতে আমাদের ইতিহাস হারিয়ে যাবে না।

আমাদের অনাগ্রহের প্রমাণ: ২০০০ সাল থেকেই পেয়েছি। আমি 'শহিদজায়া হাসনা হেনা কাদির' ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'মুক্তিযুদ্ধের ওপর শ্রেষ্ঠ রিপোর্ট'-এর জন্য। প্রথমবার মাত্র তিনটি রিপোর্ট জমা হয়। যদিও পুরস্কারটি কম টাকার জন্য বাদ দেওয়া হয়। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম! তাই এই বিষয়ে সাংবাদিকরা নিম্নবর্ণিত উপায়ে কাজ করতে পারেন:

১. মুক্তিযুদ্ধকালের অনেক অজানা ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট করা বা ফিচার লেখা। জীবিত মুক্তিযোদ্ধা বা এলাকাভিত্তিক ঘটনা নিয়ে লেখা।
২. শহিদপরিবার থেকে তথ্য নিয়ে লেখা।
৩. মুক্তিযোদ্ধা বা শহিদপরিবারগুলোর সঙ্গে কোনো অন্যায় হলে, তা নিয়ে রিপোর্ট করা। এতে সুখ-দুঃখের অনেক কাহিনি বের হয়ে আসবে।
৪. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুষ্ঠান, প্রেস কনফারেন্স ও সংবাদবিজ্ঞপ্তি গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করা। টেলিভিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৫. সরকারকেও তথ্য দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করা।
৬. আমি পর্যবেক্ষণ করে বলছি, আমরা প্রথমেই খুঁজি কে হবেন প্রধান অতিথি। একজন সিনিয়র রিপোর্টার আমাকে বলেছিল তিনি কোনো নিউজ খুঁজে পাচ্ছেন না অনুষ্ঠানের। তাই সেটা তিনি প্রকাশ করবেন না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি যদি মুক্তিযুদ্ধকে গুরুত্ব দিতেন এবং আমাদের গর্বের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতেন, তাহলে তিনি কোনো না কোনোভাবে একটি অ্যাঙ্গেল খুঁজে খবরটি প্রকাশ করতেন। আরেকটি হলো তার 'Nose for the News' ছিল ভোঁতা। একটি ঘটনাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে রিপোর্ট করা যায়, এটা হয়তো তার জানা ছিল না। সর্বশেষ বলব, গণমাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ পদক্ষেপ নেবেন এই বিষয়ে অনীহা যেন না থাকে। মালিক পক্ষকেও এ বিষয়ে লাভের চিন্তা না করে গুরুত্ব দিতে হবে। সংবাদমাধ্যমের ভূমিকায় আমাদের যে গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে, তা আরও একটি বড়ো অর্জন হবে এই থেকে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও জাতিসংঘের দ্যাগহ্যামারশল্ড স্কলার, সাবেক মিনিস্টার (প্রেস), বাংলাদেশ দূতাবাস, লন্ডন

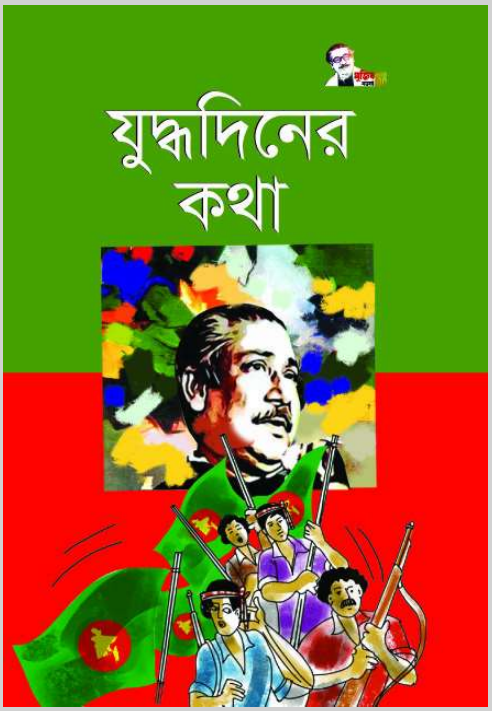

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাধীনতাযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা

ফরহাদ মাহমুদ

স্বাধীনতাযুদ্ধ কোনো জাতির জীবনে বারবার আসে না। এর চেয়ে বড়ো গর্বের বিষয়ও আর কিছু হতে পারে না। ১৯৭১ সালে গোটা বাঙালি জাতি একবিন্দুতে এসে মিশেছিল, অংশ নিয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। কেউ রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে, কেউ তাদের আশ্রয় দিয়েছে, কেউ দিয়েছে খাদ্য, কেউ বা জুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। সেই মুক্তিযুদ্ধে আরও একধরনের যোদ্ধা ছিলেন–কলমসৈনিক। বাংলাদেশের কলমসৈনিক তথা সাংবাদিকরাও মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নির্মাণের সময় থেকেই জনমত সৃষ্টিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পাকিস্তানি শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা ছিলেন সোচ্চার। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনে যেমন সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, পরবর্তীকালে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকদের টালবাহানা জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের নয় মাস তারাও নিজের জীবন বিপন্ন করে রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যগাথা তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদরদের নৃশংসতা তুলে ধরেছেন। দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

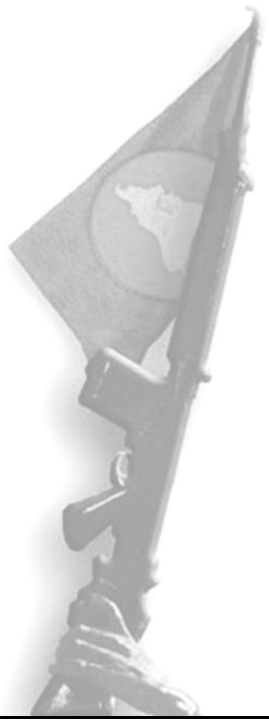

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে যখন ঘুমন্ত মানুষকে হত্যার মিশনে নামে, লাশের পাহাড় গড়ে তোলে, তখনও সাংবাদিকরা পিছিয়ে যাননি। ভয়ে আত্মগোপন করেননি। তারা সেই গণহত্যার খবর সংগ্রহ করেছেন। নগরীর পথে পথে রাতের নৈঃশব্দ্যকে বিদীর্ণ করে ছুটে চলা ট্যাংক আর এর ওপরে থাকা হায়েনাদের উল্লাসকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন অসীম সাহসী চিত্রসাংবাদিকরা। পরদিন ভোরে চুপিসারে নগরীতে ঘুরে ঘুরে নিরীহ বাঙালির রক্তাক্ত মৃতদেহের ছবি তুলেছেন, যা আজও পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সাক্ষ্য দেয়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নির্মাণে এ দেশের গণমাধ্যমের যে শক্তিশালী ভূমিকা ছিল, এ কারণে গণমাধ্যমও ছিল পাকিস্তানি শাসকদের চক্ষুশূল। তাই পাকিস্তানি বাহিনী একই সঙ্গে এ দেশের সংবাদপত্রের ওপরও হামলে পড়ে। ২৫ মার্চের কালরাত্রি থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী তিনটি প্রধান সংবাদপত্রের অফিস ও প্রিন্টিং প্রেস পুড়িয়ে দেয়। পত্রিকাগুলো হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও দ্য পিপল। সংবাদ পোড়ানোর সময় সাংবাদিক ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক শহীদ সাবেরকেও পুড়িয়ে মারা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পূর্বদেশ, মর্নিং নিউজ এবং পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার অফিসেও হামলা চালায়। ঢাকা প্রেস ক্লাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অত্যন্ত সরব

'স্বরাজ' ও 'বাংলার বাণী'-এর মতো কয়েকটি সাময়িকী বন্ধ করে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কিংবা স্বাধীনতা-পূর্বকালে এ দেশের সাংবাদিক সমাজ যে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে, যে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেছে, তা তুলনাহীন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি শাসকরা গণহত্যার যে নীলনকশা তৈরি করছিল, তা অনুমান করে ১৯৭১ সালে ২৩ মার্চ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বৈঠকে বসে এবং পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সঙ্গে তারা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সংবাদ পরিবেশন না করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক সাংবাদিকই পাকিস্তানি শাসকদের রোষানলে ছিলেন। সেই রোষ থেকেই স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বাছাই করে অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। সেই শহিদ সাংবাদিকদের মধ্যে আছেন সিরাজুদ্দীন হোসেন (ইত্তেফাক), আ ন ম গোলাম মোস্তফা (পূর্বদেশ), নিজামুদ্দীন আহমদ (বিবিসি), শহীদুল্লা কায়সার (সংবাদ), সৈয়দ নাজমুল হক (পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল), এস এ মান্নান (লাডুভাই) (পাকিস্তান

> সেই বিচার প্রক্রিয়ায় সাংবাদিকদের তুলে আনা অনেক তথ্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। অনেক সাংবাদিক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের বর্ণনা দিয়েছেন

অবজারভার), শহীদ সাবের (সংবাদ), খোন্দকার আবু তালেব, মুহম্মদ আখতার, আবুল বাশার, চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান, শিবসাধন চক্রবর্তী, সেলিনা পারভীন প্রমুখ। যুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত সম্প্রচার হতো। বেশকিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বেতারকেন্দ্র ও পত্রিকায় যেসব সাংবাদিক কাজ করতেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তারা মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ ও প্রচার করেছেন। তারা নমস্য। তারা বাঙালি জাতির গর্ব।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও মুক্তিযুদ্ধের অনেক জানা-অজানা ঘটনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা অনেক শ্রম, মেধা ও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানি বাহিনী দেশের কোথায় কোথায় কী ধরনের নৃশংসতা চালিয়েছে, কোথায় কোথায় গণহত্যা হয়েছে, মুক্তিবাহিনী কোথায় কোথায় সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেছে–এমন অনেক তথ্যই তারা তুলে এনেছেন। বস্তুনিষ্ঠভাবে সেগুলো জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। তা সত্ত্বেও অনেক ইতিহাসবিদ এসব প্রচেষ্টাকে খুবই অপ্রতুল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, এখানে সাংবাদিক-গবেষকদের আরও সক্রিয়তার প্রয়োজন ছিল। আর ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর দেশ চলে যায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপরিপন্থিদের হাতে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা ক্ষমতায় চলে আসে। শাহ আজিজুর রহমান, আবদুল আলিমের মতো রাজাকাররাও জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় স্থান করে নেয়। যে জামায়াত নেতা গোলাম আযম প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাকেও ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি শুরু হয়। পরবর্তীকালে খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায়ও স্থান করে নেয় নিজামী-মুজাহিদের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধীরা।

দেশ যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করার চেষ্টা চলতে থাকে, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে দেওয়া হতে থাকে, রাজনীতি থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা চালানো হতে থাকে–তখনও এ দেশের বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির আন্দোলন-সংগ্রামকে তারা অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দল আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। যদিও ২০০১ সালের নির্বাচনে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে ছিটকে যায় এবং বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় ফিরে আসে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এর পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া তৈরি হয়। আর এখানেও জনমত তৈরিতে সাংবাদিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ক্ষমতায় এসে জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারকাজ শুরু হয়। এরই মধ্যে অনেক মানবতাবিরোধী অপরাধীর বিচার সম্পন্ন হয়েছে। রায়ও কার্যকর করা হয়েছে। সেই বিচার প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে। সেই বিচার প্রক্রিয়ায় সাংবাদিকদের তুলে আনা অনেক তথ্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। অনেক সাংবাদিক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের বর্ণনা দিয়েছেন।

স্বাধীনতার পাঁচ দশক পূর্ণ হয়েছে। এই পাঁচ দশকে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য যেমন আছে, তেমনই আছে অনেক ব্যর্থতাও। এর একটি বড়ো কারণ সম্ভবত স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছর পর দেশে এক নিষ্ঠুর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং শাসনক্ষমতা স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে চলে যাওয়া। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ প্রয়াসের অভাব প্রকটভাবে দেখা গিয়েছে। অনেক সাংবাদিক-গবেষক ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে এনেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে আনার ক্ষেত্রে তাদের সেসব কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এর সঙ্গে যদি সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ আরও জোরদার হতো, তাহলে আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ হতে পারতাম।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। যারা মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এরই মধ্যে মানুষের অনেক ঘটনা বিস্মৃত হয়েছে। এখনো মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার আছে। এজন্য সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, ঐকান্তিকতা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এক্ষেত্রে আরও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, বিলম্বে হলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সুরক্ষার সেসব উদ্যোগ আরও সংগঠিত হবে, আরও বেগবান হবে। সেখানটায় নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক-গবেষকদের অনেক বেশি অবদান রাখতে হবে।

লেখক: গবেষক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা ভেতরে-বাইরে

সালাম জুবায়ের

সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত একটি বিষয়। মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, সমাজ ও মহাজগতের এমন কোনো বিষয়-অবস্থান নেই, যেখানে সাংবাদিকতা প্রবেশ করেনি, জাগতিক জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যা সাংবাদিকতা কাভার করে না। সাংবাদিকতার এই বিস্তৃতি মানবজাতির বিকাশ ও কল্যাণের প্রয়োজনেই। জ্ঞানে-গুণে মানুষ যত এগিয়েছে, সাংবাদিকতা এতে অনুষঙ্গ হিসাবে সব সময়ই পাশে থেকেছে। এই মহাজগৎ ও ভোগবাদী বিশ্ব যত আধুনিক হচ্ছে, সাংবাদিকতা ততই বিকশিত হচ্ছে।

এসব অনুষঙ্গের কারণে বলা হয়, সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্র মানবজীবনের সত্য, সুন্দর ও বিবেকের দর্পণ। যদিও প্রচলিত সাধারণ বিবেচনায় সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সংবাদপত্র রাষ্ট্রের সঠিক এগিয়ে যাওয়ায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। সমাজ-রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান সাধারণ-অসাধারণ ঘটনাবলি মানুষের সামনে ইতিবাচকভাবে, নির্মোহ অভিব্যক্তি এবং নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব।

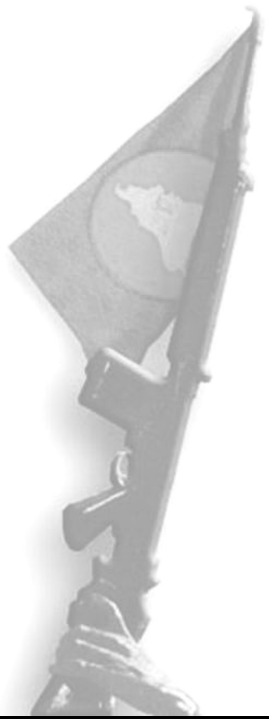

সাংবাদিকতা পেশার বহুমুখী ও ব্যাপক বিকাশের বর্তমান অবস্থা এবং কার্যকর ভূমিকার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে আছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা হিসাবে মূল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ব্যক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পথ ছিল মুক্তিযুদ্ধ। এটা যেমন মুক্তিযুদ্ধের আগে, তেমনই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, এখনো চলমান।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা নানা কারণে আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমিক ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জনেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের যেমন আলোড়িত করে, তেমনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ে তুলতে, উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পেশাগতভাবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা আমাদের পথ দেখায় এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। ফলে আমাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার অবস্থান ও কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার বয়স বেশি দিনের নয়। তবে যুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার বয়স প্রায় শত বছর। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা এক অর্থে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাসংগ্রামকে উপজীব্য করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর ব্যাপক অর্থে যুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার হাতেখড়ি বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর

পর। এর আগে সাংবাদিকতার বিকাশ তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে যুদ্ধবিগ্রহ থাকলেও তা নিয়ে সাংবাদিকতা তেমন আলোড়ন তোলেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তথ্য আদান-প্রদানের বিষয় সবার সামনে আসে। বিশ্বযুদ্ধে মূল নায়করা যেমন, তেমনই সাধারণ মানুষও যুদ্ধের খবরাখবর ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য জানতে সংবাদপত্রের দিকে চেয়ে থাকত। ফলে সাংবাদিকরা যুদ্ধ নিয়ে খবর-তথ্য পরিবেশনের ব্যাপারে আরও বেশি মনোযোগী হন। একই সঙ্গে যুদ্ধভিত্তিক খবরের পাঠকও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে বড়ো বড়ো যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। এর সবকটির খবর-তথ্যই সাংবাদিকতাকে বাহন করে মানুষের দ্বারে পৌঁছেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বড়ো ধরনের যুদ্ধ বলশেভিক বিপ্লব থেকে শুরু করে কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইসরায়েল-মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ, ভারত-চীন যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ–এভাবেই যুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। কালে কালে যুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতা পেশার একটি বিশেষ শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের জানা-অজানা অনেক তথ্য-উপাত্ত জাতীয়ভাবে এবং বিশ্বজনীনভাবে তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকরাই।

সাংবাদিকতা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষকদের অনেকেরই নির্মোহ মূল্যায়ন এই যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বয়স ৫০ পেরিয়ে গেলেও যুদ্ধের অনেক কথা এখনো আমাদের সামনে আসেনি, অনেক ঘটনা, তথ্য-উপাত্ত আলোর মুখ দেখেনি। লাখো মুক্তিযোদ্ধা, যারা মুক্তিযুদ্ধের সামনে-ভেতরে অবস্থান করেছিলেন, অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে এখনো বেঁচে আছেন, তাদের মধ্যে অসচেতনভাবে অনেক তথ্য-উপাত্ত এখনো অনুদ্‌ঘাটিত আছে। আমাদের অনুসন্ধানের অবহেলা, অনাগ্রহ এবং সুযোগের অভাবে লুকিয়ে আছে বা অনালোচিত হয়ে আছে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যসম্পদ। এসব বিষয় আমাদের সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজন। যত দিন যাচ্ছে, ততই তা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। একই কারণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতারও গুরুত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অবস্থান করছে। দিন যত পার হবে, এর প্রয়োজনীয়তা একটুও কমবে না। বরং নতুন প্রজন্মের জন্য এসব তথ্য-উপাত্ত এবং ঘটনার বিবরণ আরও প্রখর পর্যবেক্ষণসহ চরম চাহিদা সৃষ্টি হবে। যার স্থান পূরণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকদেরই।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা দীর্ঘদিনে বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে এমন এক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা পেশায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে একদল সাংবাদিক যে মান-মর্যাদা লাভ করেছে, তা এখন ইতিহাসের অধ্যায় হয়ে আছে। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতা পেশায় তাদের অবদান বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় এবং সাংবাদিকতা পেশার শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে অধ্যয়ন ও পাঠদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন সময়ে তাদের কথা, রিপোর্ট, বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা আরও ব্যাপকভাবে প্রচারের বিষয়টি সামনে আসে।

আমরা যদি পেছন ফিরে তাকাই, এখন থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, মুগ্ধ হয়ে অবলোকন করি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিকতা পেশায় জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে স্মরণীয়-বরণীয় হিসাবে আমাদের ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে আছেন যুক্তরাজ্যের দ্য টেলিগ্রাফের সায়মন ড্রিং, যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) আলোকচিত্রী মাইকেল লরেন্ট, ব্রিটেনের সানডে টাইমসের পাকিস্তান সংবাদদাতা অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, বিবিসির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সংবাদদাতা মার্ক টালি, নিউইয়র্ক টাইমসের দিল্লি সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গ প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধ সাংবাদিকতায় তাঁদের অবদান আমাদের উজ্জীবিত করেছে, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় যেমন, তেমনই পরবর্তী সময়েও। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতায় বিশেষ করে বাংলাদেশে একাত্তরে তাদের সাহস, মেধা ও অনুপম সৃজনশীলতা দিয়ে যে অবদান রেখেছেন, তা আমাদের সামনে সেই সময়ে যেমন, তেমনই এখনো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী নবীন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা তুলে ধরতে অনেক ক্ষেত্রে এনসাইক্লোপিডিয়া হিসাবে কাজ করছে। নবীন প্রজন্মের সামনে তাদের নির্মোহ, সত্য তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুপ্রেরণা এবং দেশপ্রেমের আবেগ প্রজ্বালিত করে যাচ্ছে, এখনো।

সাংবাদিকতায় সায়মন ড্রিংয়ের অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি অধ্যায় আলোকিত হয়েছিল একাত্তরে। ঢাকায় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো প্রথম দফার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষ চিত্র উঠে আসে লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে একাত্তরের ৩০ মার্চ প্রকাশিত সায়মন ড্রিংয়ের রিপোর্টে। এরপর পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় অনেক পানি গড়িয়েছে, বিশ্ব জেনেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা। সে সূত্রেই মুক্তিযুদ্ধ লাভ করেছে বিশ্বজনমতের সমর্থন-সহযোগিতা এবং দীর্ঘ যুদ্ধের পর বাংলাদেশ অর্জন করেছে স্বাধীনতা। এজন্য সায়মন ড্রিংকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বললে ভুল বলা হবে না।

এরপর অন্য যাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবারই অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুরো মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে। বাংলাদেশের দুঃসময়ে, প্রয়োজনের সময়ে, চাহিদার নিরিখে তাঁদের সেই অবিস্মরণীয় অবদান বাংলাদেশ কখনো ভুলতে পারবে না।

অনেক পরে যোগ হয়েছে বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা। তবে একাত্তরে বিদেশি এই সাংবাদিকদের প্রচেষ্টার পর ভারতের অসংখ্য সাংবাদিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতায় যে অবদান রেখেছেন, তা সাংবাদিকতার ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়। বিশেষ করে আগরতলা ও কলকাতার অনেক সাংবাদিক একাত্তরে শুধু মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ এবং তা তার সহকর্মীদের ভাগাভাগি করে একটি পৃথক অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছেন। ভারতের দুজন সাংবাদিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সময়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে এসে জীবন দিয়েছেন। তাদের সেই জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের অকাট্য সমর্থন এবং শ্রদ্ধা-ভালোবাসার প্রভাব ছিল পেশাগত দায়িত্ববোধের বাইরে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা এসব সাংবাদিকের হাতে-কলমে বিকশিত হয়েছে যেমন, তেমনই তারা তাদের রিপোর্ট দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত কার্যকর অবদান রেখেছেন। তাদের খবরের ওপর ভিত্তি করে অনেক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুক্তিপাগল মানুষ সেই সাংবাদিকদের তৈরি করা রিপোর্টের মাধ্যমেই প্রথম জেনেছে মুক্তিযুদ্ধ কোথায়-কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণভাবে সাংবাদিকতা পেশার তাত্ত্বিক কৌশল হচ্ছে অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি, ঘটনার সৃজনশীল, নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতমুক্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটনে নির্মোহ ও সত্যনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, আবেগবর্জিত মেদহীন বর্ণনা এবং সরল ভাষায় প্রাঞ্জল উপস্থাপনা। এর বাইরে আরও কিছু সাংবাদিকতাকে স্মরণীয় করে রাখে। যদিও সময়কাল, ঘটনাক্রম এবং ঘটনার কেন্দ্রে অবস্থানকারী

মানুষের নৈতিক অবস্থান সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়কে সঠিক দিকে এবং সঠিকভাবে তুলে ধরতে নিয়ামক ভূমিকা রাখে।

যুদ্ধ হোক বা হোক মুক্তিযুদ্ধ–নানা কৌশলে এগিয়ে যায় ধ্বংস বা মুক্তি–সবদিকেই। তবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার জন্য দেশপ্রেমের বিষয়টি প্রথম বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কারণ প্রোপাগান্ডা আর সাংবাদিকতা একই সূত্রে চলে না। ঘরে বসেই প্রোপাগান্ডা তৈরি করা বা উৎপাদন করা যায়, কিন্তু যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করতে তথ্যানুসন্ধানী এবং সত্যান্বেষী হতে হয়। এক্ষেত্রে দেশপ্রেম বা মানুষ ও মানবকল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধতা বা শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়।

যুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক চেতনাসমৃদ্ধ। ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা বা পরাধীনতার নিগড় থেকে নিজ দেশকে রক্ষার নৈতিক যুদ্ধ, অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। অন্যদিকে কোরিয়ার যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, চীন-ভারত যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধ। যেমনটা এখন হচ্ছে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে। ফলে যুদ্ধভিত্তিক এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা একই ধরনের হওয়ার সুযোগ কম। যদিও যুদ্ধ যুদ্ধই, যুদ্ধের সাংবাদিকতায় মানসিকতার বিষয় এবং বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজের চিন্তাচেতনা প্রকাশের চেয়ে বাস্তব অবস্থার বর্ণনাই প্রধান হয়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতায় মানবিক বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হয়। মানবিক হতে হয় এজন্য যে, মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু একটি দেশের সার্বক্ষণিক, মুক্তি বা বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত, প্রবল অর্থে একটি জনযুদ্ধ, গুটি কয়েক কুলাঙ্গার বাদ দিয়ে সব মানুষের বাঁচা-মরার লড়াই, সেহেতু দেশের সব শ্রেণি-পেশা, বয়স, ধর্ম-বর্ণ এবং জনগোষ্ঠীসহ আপামরসাধারণের কথা মাথায় রাখতে হয়। মানুষের বীরত্বগাথা, শৌর্যবীর্য, জীবনবাজি রেখে অভিযানের কথা এবং হানাদার বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়ন এবং মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকা গণমানুষের কষ্ট-হাহাকারের কথা বলতে গিয়ে যেন মানুষের প্রতি অমানবিক হয়ে না পড়ি। মানবিকতাকে বাদ দিয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে কারও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার ইস্যুটি যেন অবজ্ঞা না করি। যদিও এই মানবিকবোধ সাংবাদিকতার সাধারণ এবং অবশ্যপালনীয় তাত্ত্বিক বিষয়ও।

তবে এ ব্যাপারে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের অবকাশ আছে অবশ্যই। ভিন্নমতও হয়তো ব্যাপকভাবে থাকতে পারে। বলা যেতে পারে–মানবিকতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয় না, হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে অমানবিক ঘটনা অনেক ঘটেছে, পাকিস্তানিরা অমানবিকভাবে অত্যাচার-নির্যাতন এবং ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে বাংলাদেশের মানুষের ওপর। এমনকি তারা মহান মানবিক ও শান্তির ধর্ম ইসলাম রক্ষার দোহাই দিয়েও মানুষ হত্যা করেছে। নিছক মানবিকতা দিয়ে সে সর্বগ্রাসী অমানবিক কর্মকাণ্ড রোখা সম্ভব ছিল না, সম্ভব নয়ও। মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বহুলপ্রচলিত বাক্য হচ্ছে–'একটি নিরপরাধ মানুষকে বাঁচাতে প্রয়োজনে দশজন অপরাধীকেও ক্ষমা করে দেওয়া উচিত'। যদিও যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী প্রচলিত অনেক মানবিক চুক্তি ও দলিলে এসব কথা গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু যারা যুদ্ধবাজ বা নিজের দম্ভ প্রদর্শনের জন্য প্রায়ই যুদ্ধের হুমকি দিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভ্রাতৃত্ববোধ অবদমন করে তাদের কাছে মানবিকতার মূল্য নামমাত্র।

তবে যাই বলি বা যেভাবেই বলি না কেন, কোনো বড়ো অমানবিক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে বড়ো কোনো মানবিক গৌরব সৃষ্টি হয় না। ফলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা করতে মানবিক বিষয়টির প্রতি অবশ্যই মান্যতা দিতে হবে। তথ্য ও ঘটনা খুঁজে বের করতে যেমন চরম আন্তরিকতা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, তেমনই মানবিক ঘটনা খুঁজতে গিয়ে নিজেকে মানবিক অবস্থানে রাখতে হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা অনেক বিষয় নিয়ে বিশাল ক্যানভাসে বিস্তৃত। যুদ্ধের উদ্দেশ্য, যুদ্ধের কৌশল, মানুষের আত্মত্যাগ, অমানবিক কর্মকাণ্ড, যুদ্ধের নামে নৃশংসতা, নির্যাতন, নারী নির্যাতন, রাজাকার-আলবদরদের কর্মকাণ্ড এবং গণহত্যা প্রভৃতি বিষয় সাংবাদিকতার বিশাল ক্যানভাসকে আকড়ে আছে। আর এর প্রতিটি দিকই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং গভীর অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। আর এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতায় সিরিয়াসনেস বেশি প্রয়োজনীয়, কাঙ্ক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণও।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিককে ঘুরে বেড়াতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। অনুসন্ধানী মন নিয়ে সবখানেই মানুষের সঙ্গে, যারা একাত্তরে যুদ্ধের মাঠে ছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাদের কাছ থেকে তথ্য, যা এতদিন জানা হয়নি, সেসব তথ্য-ঘটনা বের করতে হবে। এতদিন, যুদ্ধের সময় থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা করেছেন, তারা সে কাজটিই করেছেন। সেই কাজের তখন যেমন গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয় ছিল, এখনো তাই আছে। এভাবে তথ্য-উপাত্ত খুঁজে বের করার শেষ নেই–এখনও চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার কোথাও থেমে থাকার ব্যাপার নেই।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতায় জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়। যুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতায়ও মৃত্যুঝুঁকি প্রবলভাবে বিদ্যমান। যুদ্ধের মাঠে কোনো পক্ষই একেবারে ইচ্ছা করে সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে না। কখনো কখনো ঘটে হয়তো। কিন্তু যুদ্ধে সাংবাদিকরা অনেক ক্ষেত্রেই আঘাতপ্রাপ্ত হন সরাসরি যুদ্ধের মাঠে উপস্থিত থাকেন বলে, কেউ তাকে লক্ষ্য করে হামলার কারণে নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতায় এর বাইরেও মৃত্যুঝুঁকি থাকে। কারণ মুক্তিযুদ্ধে একটি পক্ষ থাকে যারা দেশের অখণ্ডতার নামে একটি দেশ, একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তারা কখনোই চায় না তারা যে হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, যেভাবে নারী নির্যাতন করছে, এর খবর কেউ সংগ্রহ করুক এবং বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিক। এজন্য তারা খবর সংগ্রহকারী সাংবাদিককে দেখামাত্র হত্যা করতে পিছপা হয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এমন কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে শুরুতে এবং শেষেও অনেক সাংবাদিক পাকিস্তানিদের বর্বরতায় জীবন দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে শুরুতে, ২৫ মার্চের গণহত্যা শুরুর আগেই পাকিস্তানিরা ঢাকায় সমবেত বিদেশি সাংবাদিকদের খুঁজে খুঁজে বের করে অস্ত্রের মুখে তাদের বহিষ্কার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সাংবাদিক মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে ছিলেন, পাকিস্তানিদের ইচ্ছানুযায়ী ঢাকা ত্যাগ না করে মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্ট করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুঝুঁকি ছিল প্রায় শতভাগ। কিন্তু অনেকেই এই 'জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে থাকা' অনেকটাই বীরত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন শুধু সাংবাদিকতার প্রতি অনাবিল নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য। এক্ষেত্রে সায়মন ড্রিং ও মাইকেল লরেন্ট তো ইতিহাস গড়েছেন। একাত্তরের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানিদের গণহত্যা শুরুর পর এ দুই সাংবাদিক যেভাবে মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানিদের চোখ এড়িয়ে ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন, সে কাহিনি কোনো গোয়েন্দা অভিযান বা রূপকথাকেও হার মানায়। অবশ্য এজন্য তারা ইতিহাসের পাতায় বরণীয় হিসাবে স্থান পেয়েছেন,

ভবিষ্যতেও ইতিহাস তাদের যথার্থ মূল্যায়নে মনে রাখবে। মানুষের মনে তাদের এ অবস্থান অটুট থাকবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেমন, তেমনই স্বাধীন দেশেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকরা অনেকটা মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে বসবাস করেছেন। এই মৃত্যুঝুঁকি অনেকটাই ভিন্ন রকম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশের সব মানুষ অংশগ্রহণ করেছে–এমনটা নয়, কিছু লোক ছিল যারা আদর্শিক কারণে মনেপ্রাণে ছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে। তারা দেশপ্রেমিক মানুষের বিবেচনায় ছিলেন, এখনো আছেন, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। তারা চাননি পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরা হোক, বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হোক। ইসলাম রক্ষার নামে তারা পাকিস্তান রক্ষা করতে গিয়ে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি মেরেছে। সেই সব মানুষ রাজাকার, আলবদর, আলশামস হিসাবে পাকিস্তানের পক্ষে নিজ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন ছিল, এখনো তেমন আছে। পঁচাত্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এসব মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের অনুসারীরা এখনো রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বহাল তবিয়তে আছে। তারা এখন 'চারদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস' অবস্থায় আমাদের মধ্যে মিশে আছে। তারা চায় না মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো তৎপরতা দেশে হোক। এতে তাদেরকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে ঘৃণার আগুনে জ্বালানো হয়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা যারা করেন, তাদের 'জাতশত্রু' মনে করে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকদের 'ধ্বংস করতে' তারা সব সময়ই তৎপর। তাদের কাছ থেকেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকদের মৃত্যুঝুঁকি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে একজন সাংবাদিকের নাম এই মুহূর্তে উল্লেখ করা যায়। তিনি হলেন, তাজুল মোহাম্মদ। তিনি এখন দেশ ছেড়ে কানাডায় প্রবাস জীবনযাপন করছেন। তার দেশত্যাগের কারণ মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের কাছ থেকে 'হত্যার হুমকি'। তার অনেক লেখা রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের মুখোশ উন্মোচন করেছে। এজন্য স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাকে হুমকি দেয়। এজন্য তিনি কানাডায় চলে যান।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে একাত্তরের রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছে। আদালতে এসব মামলার বিচারকাজ চলার সময় সরকারপক্ষ যেসব দলিল এবং তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছে, এর বেশির ভাগই ছিল সংবাদপত্র থেকে নেওয়া। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকরা যুদ্ধসময়ে এবং পরেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে যেখানে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসররা গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, সেখান থেকে ঘটনার শিকার-ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত উদ্‌ঘাটন করে পত্রিকার পাতায় তুলে ধরেছেন।

এক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় সাক্ষ্য উপাদান হিসাবে সাংবাদিকতাই বেশি কাজে লেগেছে। এ কারণে যারা যুদ্ধাপরাধের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলেছে, তাদের স্বজনরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকদেরই তাদের শত্রু মনে করে। তারা স্বজন হারানোর কারণে সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের ওপর 'যারপরনাই ক্ষিপ্ত' থাকবে–এটাই স্বাভাবিক। আর এজন্য তারা প্রতিনিয়ত প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবেই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা সাংবাদিকতা করবেন, তাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির এ মনোভাবের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের জন্ম ও অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের দেশপ্রেমকে যেমন শানিত করে, তেমনই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার ফসল আমাদের তরুণ প্রজন্মকে যেজন্য আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি, সেই আদর্শ–অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত চিন্তাচেতনার দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে। এজন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা আমাদের ভেতরে-বাইরে আলোড়িত করে এবং অনন্তকাল ধরে তা করবে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

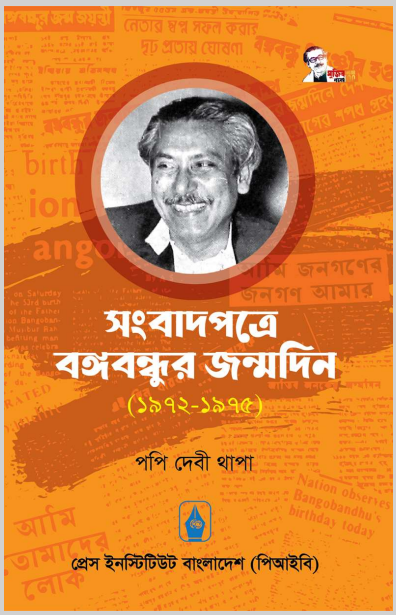

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

আজকের দিনে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা

আলী হাবিব

আমরা মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পেরিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা কেন? কারণ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধটি ছিল বহুমাত্রিক। আমাদের সংগ্রাম ছিল–মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামেও নানা মাত্রা যোগ হয়েছে ইতিহাসের নানা বাঁকে। কোনো দ্বিধা না রেখেই আমরা বলতে পারি–সংগ্রামের শুরু অনেক আগেই। মানুষ যে স্বাধীনতার জন্য তৈরি হয়েছে, প্রস্তুতি নিয়েছে, সেটা তো আর একদিনে হয়নি। দিনে দিনে এই সংগ্রামের একটা রূপ সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

মূল প্রশ্নে আবার নতুন করে ফেরা যাক। মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পেরিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা কেন? কারণ, বাংলাদেশের গত অর্ধশতকে এমন সময় এসেছে, যখন ইতিহাসকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসকে খণ্ডিত করে মিথ্যার আবরণে নতুন করে শেখানোর চেষ্টা হয়েছে। আর সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন করে তুলে আনার প্রয়োজনটা বোধহয় অনুভূত হচ্ছে। বাঙালি জাতির জীবনের মহত্তম ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু সেটাকে ঘিরে চরম বিভ্রমের সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসচেতনতা ও সমগ্রতার দৃষ্টির ঘাটতি থেকে একসময় মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডিত পর্যালোচনা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মহৎ মানবিক আদর্শের পরিপন্থি সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন নস্যাতে সচেষ্ট হয়েছে একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী। কোনো কোনো গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধকে কেবলই সামরিক দিক দিয়ে বিবেচনা করতে চেয়েছে।

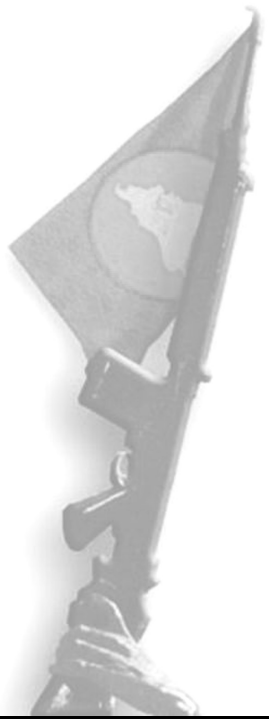

কিন্তু এটা তো কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সর্বাংশে জনযুদ্ধ। জনযুদ্ধ কী? জনসাধারণ সমর্থিত যুদ্ধ। মাটি ও মানুষের কাছ ঘেঁষে উঠে আসা সংগ্রামই তো যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণা জুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন বাহিনী ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা যোগ দিলেও সবচেয়ে বড়ো বিষয়টি ছিল সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ। আর সে কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। জাতির মহত্তম জাগরণে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্তি, স্বপ্ন ও আশার মাত্রা এবং দেশের মুক্তিসংগ্রামে নিপীড়িতজনের অংশগ্রহণকে নতুন করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা কার্যকর ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি আধুনিক সমাজ-গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সব ধরনের রাজনৈতিক খেলার অবসান ঘটাবে। দূর করবে সব ধরনের বিভ্রম। তাতে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা আরও নিবিড়ভাবে অনুধাবনে সমর্থ হবে সমাজ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই অর্ধশতক পার হয়ে এসে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার অনুসন্ধান পর্বটি কোন পথে এগোবে?

প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে আমরা কী করতে চাই। এর সঙ্গে পাঁচ ডব্লিউ এবং একটি এইচ (5W, 1H) ঠিক করে ফেলতে পারলেই আমাদের প্রাথমিক কাজটা শেষ হয়ে গেল। এরপর পথে নামা।

মনে রাখা দরকার, আমাদের যুদ্ধস্মারক হারিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে–যুদ্ধস্মারক বলতে আমরা কী বুঝতে চাইছি। আমরা কিন্তু কোনোভাবেই ভুলে যাব না যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধটি ছিল সর্বাংশে জনযুদ্ধ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে।' ফলটা হয়েছে এই যে, নিরস্ত্র জাতির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লে বীর বাঙালি খালি হাতে যেমন রুখে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই যার যা আছে, তাই নিয়ে ঘর ছাড়তেও দ্বিধা করেনি। অনেকে আবার পরাস্ত শত্রুবাহিনীর ফেলে যাওয়া অনেক সরঞ্জাম রেখে দিয়েছেন স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। এগুলো যুদ্ধস্মারক। আবার অনেকে যুদ্ধের গল্প মনে রেখেছেন। যুদ্ধযাত্রা থেকে শুরু করে বিজয়ের দিনটি পর্যন্ত নানা পর্বের বিস্তারিত গল্প তুলে রাখা আছে অনেকের মনে। এগুলোও যুদ্ধস্মারক।

আরও আছে যুদ্ধের স্পট। এমন অনেক যুদ্ধ হয়েছিল, যেগুলো এখনো দেশ-বিদেশের সামরিক বাহিনীর একাডেমিক কার্যক্রমে পড়ানো হয়। বিষখালীর যুদ্ধ, শিরোমণির যুদ্ধ তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এমন আরও অনেক যুদ্ধ রয়েছে। এসব স্থান কি সেভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে? যদি না হয়ে থাকে, কেন হচ্ছে না। কেন সংরক্ষণ করা দরকার–এসব তুলে ধরার সময় এসেছে। কারণ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চরম বিভ্রম সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

আমরা ইম্পেরিয়াল ওয়ার মিউজিয়ামের কথা জানি। ইংল্যান্ডের পাঁচটি স্থানে রয়েছে এই জাদুঘরের শাখা, যার তিনটি লন্ডনে। ইম্পেরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের নাগরিকদের সামরিক যুদ্ধপ্রচেষ্টা এবং ত্যাগ রেকর্ড করা। ১৯১৪ সাল থেকে ব্রিটিশ বা কমনওয়েলথ বাহিনী জড়িত রয়েছে–এমন সব উপাত্ত সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে সেখানে। জাদুঘরের লক্ষ্য 'আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসের গবেষণা ও বোঝার ব্যবস্থা করা, উৎসাহিত করা এবং যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা অন্যদের জানানো।'

মালয়েশিয়ার সাবাহের পুতাতান জেলার কাম্পুং পেরিঙ্গাতান পেটাগাসে রয়েছে পেটাগাস ওয়ার মেমোরিয়াল। একটি স্মারক উদ্যান। এটি সাবাহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে করা। জেসেলটন বিদ্রোহে জড়িত থাকার অপরাধে উত্তর বোর্নিওর জাপানি দখলদার বাহিনী ১৯৪৪ সালের ২১ জানুয়ারি এই স্থানে ৩২৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। উদ্যানটি ঠিক সেই জায়গায় তৈরি করা হয়েছে, যেখানে গণহত্যা হয়েছিল এবং যেখানে প্রাথমিকভাবে নিহতদের কবর দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশে এমন অনেক স্থান রয়েছে। বধ্যভূমি রয়েছে। সব গণকবর চিহ্নিত হয়নি। যেগুলো চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলোর সব ইতিহাস কি লিপিবদ্ধ হয়েছে?

এখন কথা হচ্ছে–এই ইতিহাস আমরা তুলে আনব কী করে? মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতায় আমাদের নিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের সহযোগিতা। এক্ষেত্রে ওরাল হিস্ট্রি (oral history) গবেষণা পদ্ধতি বিশেষভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি হবে সবচেয়ে উত্তম। অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, 'ইতিহাসের গবেষকরা যেসব উৎসের ওপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনা করে থাকেন, সেগুলো হলো প্রধানত লিখিত দলিল, পুস্তকপুস্তিকা, পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র, ডায়েরি প্রভৃতি। মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রি এসব থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে এটি মৌখিক তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি যেসব মানুষকে জেনেছেন বা যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন বা যেসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেসব বিষয়ে তথ্য প্রদান করেন। তবে এ ধরনের মৌখিক তথ্য লিখিত দলিলের বিকল্প নয়, এগুলো হলো তার পরিপূরক।'

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনাগুলোর সাক্ষী, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ, নিপীড়ন ও অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছেন বা সেগুলোর শিকার হয়েছেন; তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারীদের দ্বারা টেপরেকর্ডারের সাহায্যে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারলে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বহুবিধ মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একবার এমন একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। একজন সাংবাদিক যখন এই কাজটি করতে যাবেন, তখন শুরুতেই তাকে প্রকাশিত বইপুস্তক, গবেষণা, পত্রিকা ঘেঁটে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর নিজের কাজটি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

এখন কথা হচ্ছে–আমাদের কী করতে হবে? প্রথমত, লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আমি কি করব? এখনো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুলোকে আলাদা করে কাজ করা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থীশিবির; যুদ্ধের ময়দান থেকে যারা সংবাদ পাঠাতেন, সেই সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতার কথা; সম্মুখসমরের নির্ভীক যোদ্ধা থেকে শুরু করে আরও অনেক ক্ষেত্রে কাজ করার আছে।

রাজাকারদের ওপর কি সেভাবে কোনো কাজ হয়েছে? কোন কোন এলাকায় কারা রাজাকারের খাতায় নাম লিখিয়েছিল? বিজয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে কারা পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায়? এসব ইতিহাসও জানা দরকার। বীর মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন। রাজাকারদের অস্ত্রগুলো গেল কোথায়? সাংবাদিকদের একটি বড়ো অনুসন্ধানের জায়গা হতে পারে আলশামস, আলবদর ও রাজাকার বাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী এই ঘাতক বাহিনীগুলোর সদস্যরা রাতারাতি কোথায় উধাও হয়ে যায়, আবার কীভাবে তারা ফিরে আসে? কারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে তাদের ফিরে আসার পথ কারা কীভাবে তৈরি করে দিয়েছিল–এসবই এখন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার বিষয় হওয়া উচিত বলে মনে করি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এদেশেরই কিছু কুলাঙ্গার হাত মিলিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। সেই সময়ে গ্রামে গ্রামে গঠিত হয়েছিল পিস কমিটি বা শান্তি কমিটি। থানা-মহকুমা-জেলা কমিটিও ছিল তাদের। তারা আজ কে কোথায়? একাত্তরে গ্রামে, থানায় বা মহকুমা ও জেলায় তাদের ভূমিকা কী ছিল?

অনুসন্ধানের আরও একটি জায়গা হতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো। সেই সময়ের রাজনৈতিক দলগুলোর কী ভূমিকা ছিল, সেটাও সবার জানা দরকার।

লেখক: সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সাংবাদিকের দায়

ড. হারুন রশীদ

শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। যে সমাজে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে; সেখানে দুর্নীতি, অনিয়ম অনেকাংশেই হ্রাস পায় এবং একটি জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠালাভ করে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে গণমাধ্যমকে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক হতে হবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তিতে বিভাজিত সমাজব্যবস্থায় এর অন্যথা দেখা যায় এখানে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অবশ্যই সেই দেশের সংবিধান এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকেই প্রতিষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধের বিচার চলছে। কিন্তু আদালতের কার্যক্রম গণমাধ্যমে বিশেষভাবে উঠে আসছে না। কোনো কোনো গণমাধ্যম বরং উলটা অবস্থান নিয়েছে, যা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং নীতি-আদর্শের বলিদান ছাড়া আর কিছুই নয়। বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তিযুদ্ধকালীন অপরাধগুলো সাক্ষ্যপ্রমাণে যেভাবে উঠে আসছে, অনেক গণমাধ্যমই সেগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরছে না। একাত্তরে ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকার-আলবদর-আলশামসের চরিত্র নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা গণমাধ্যমের অন্যতম দায়। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একটি দেশ সঠিক ইতিহাস আশ্রয়ী হয়ে না চলতে পারলে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব নয়।

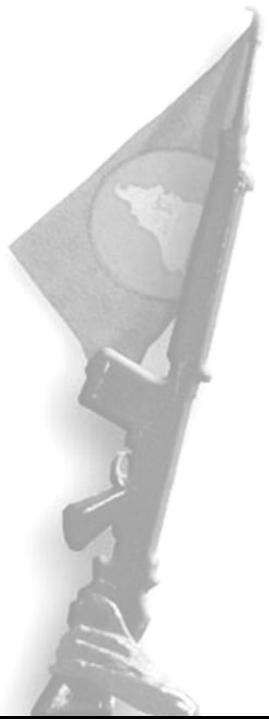

মনে রাখা প্রয়োজন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে স্বাধীন হওয়া একটি রাষ্ট্রের জন্য সেই রাষ্ট্রের জন্ম-ইতিহাস তুলে ধরাটা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অংশ। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, এর চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। অজ্ঞতা, অন্যায় ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও কাজ করেন সাংবাদিকরা। সুস্থ ও সচেতন সমাজ বিনির্মাণে এটা খুব জরুরি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সাংবাদিকদের সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মোৎসর্গের বীরত্বগাথা ছড়িয়ে দিতে হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। যাতে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবন ও কর্ম থেকেও যেন নতুন প্রজন্ম শিক্ষা নিতে পারে, এজন্যও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যার পর এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। তাই স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা জরুরি, বিশেষ করে সাংবাদিকদের। সংবাদকর্মীকে নিয়মিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন, মহান শহিদদের আত্মত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করবে।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ক্ষমতাসীন হয়ে এই চেতনাকে ধ্বংস করার নীলনকশা বাস্তবায়ন করে। সংবিধানে যুক্ত হয় বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এই কাজগুলো করা হয় ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিকে ব্যবহার করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য। সামরিক শাসনামলে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়, তা এখন ফুলে-ফলে মহিরুহ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে সাম্প্রদায়িক শক্তি নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কখনো মন্দিরে রাখা হয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, আবার কখনো গুজব রটিয়ে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে। অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে ভোট দেওয়ার জন্য ধর্ষণের শিকার হতে হয়। এ যেন ধর্মের নামে একাত্তরের নারী নির্যাতনের পৈশাচিক ধারাবাহিকতা।

১৯৭২ সালের ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রথম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্রকে নির্বাচন করা হয়। এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়।

১৯৭২ সালের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এই মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।'

সাম্প্রদায়িকতা উন্নয়ন-অগ্রগতি-প্রগতির অন্তরায় যা মুক্তিযুদ্ধেরও চেতনাবিরোধী। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের সচেতন থাকতে হবে। তাদের লেখার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা ছড়িয়ে দিতে হবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করলাম আমরা। এই ৫০ বছরে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের নির্বাসিত চেতনাও ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা এদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং যাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় এদেশের লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, মা-বোনের সম্ভ্রম কেড়ে নেওয়া হয়েছিল; বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তারা আবার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। সামরিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এরা ক্ষমতার স্বাদও গ্রহণ করে।

মনে রাখতে হবে, যুদ্ধাপরাধীরা মানবতার শত্রু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ইতিহাসের অনেক কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পন্ন হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগে বসনিয়ায় গণহত্যার দায়ে সার্বিয়ান সমরনায়কের বিচার হয়েছে এবং তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কাম্পুচিয়ায় হত্যাযজ্ঞ চালানোর দায়ে পলপট সরকারের কয়েক নেতার বিচারের জন্য নমপেনে একটি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল। হত্যাযজ্ঞ চালানোর কয়েক বছর পর এ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশেও ৪১ বছর পর যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরুর মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এখন এ বিচারকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে হবে সমাপ্তির দিকে।

রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন করে এদেশের ঘৃণ্য কুলাঙ্গাররা সেদিন পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন জুগিয়েছিল। এই গণহত্যা যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ছিল, সেটা তো ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। যুদ্ধাপরাধীদের মানবতাবিরোধী অপরাধের কথা মানুষকে জানাতে হবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে। যাতে স্বাধীনতাবিরোধীরা আর কখনো এদেশে শিকড় গাড়তে না পারে।

বীর মুক্তিযোদ্ধারাই ইতিহাসের আঁতুড়ঘর। যতই দিন যাচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মেই তারা পাড়ি দিচ্ছেন অনন্তলোকে। জীবিতাবস্থায়ই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতাপূর্ণ বীরত্বগাথা তুলে ধরতে হবে। এজন্য তাদের সাক্ষাৎকার, পরিবার-পরিজনের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরি।

গণহত্যা: পাকিস্তানি জান্তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালায় একাত্তরে। সেই গণহত্যার মর্মন্তুদ কাহিনিও তুলে ধরতে হবে। গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে জনসমর্থন গড়ে তুলতে হবে।

বুদ্ধিজীবী হত্যা: বিজয়ের ঊষালগ্নে পরাজয় অত্যাসন্ন জেনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের হত্যায় মেতে ওঠে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেছে বেছে ধরে নিয়ে আসা হয় সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। এরপর নির্মম পৈশাচিকতায় তাঁদের হত্যা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে মেধাশূন্য করা। স্বাধীনতা পেয়েও বাঙালি জাতি যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেই নীলনকশা বাস্তবায়ন করাই ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার হীন উদ্দেশ্য।

একাত্তরের ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে হত্যা করা হয় জগন্নাথ হল, রায়ের বাজারের নদীতীর ও মিরপুরের কয়েকটি স্থানে। ডা. ফজলে রাব্বী, আবদুল আলীম চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্তোষ ভট্টাচার্য, সিরাজুল হক, চিকিৎসক গোলাম মুর্তাজা, আজহারুল হক, হুমায়ুন কবীর, মনসুর আলীসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় এ সময়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে এবং যুদ্ধ চলাকালে হত্যা করা হয় জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, গোবিন্দ চন্দ্র দেবসহ আরও অনেক বুদ্ধিজীবীকে। মুনীর চৌধুরী, আলতাফ মাহমুদ ও শহীদুল্লা কায়সারও একইভাবে হত্যার শিকার হন। আর এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সর্বপ্রথম শিকার হয়েছিলেন অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা।

একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে এই নক্ষত্রসম মানুষরাই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ কারণে তারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শোষণ, বৈষম্যসহ নানা নিপীড়নের প্রতিবাদ আসে বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকেই। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে যা পরবর্তী সময়ে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে গতি আনে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বুদ্ধিজীবীরা এমন একটি সংস্কৃতি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যা পরাধীনতার অন্ধকার থেকে দেশকে নিয়ে যাবে আলোর ভুবনে। সেই আলোর পথে হাঁটতেই বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধিকার আন্দোলনে। লাখো প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে লাল-সবুজের পতাকা।

স্বাধীন দেশে পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জাতিকে দিগ্‌ভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছে। ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাস। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের কাহিনি তুলে ধরাও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার অংশ। এর মাধ্যমেও জাতি নতুন চেতনায় শানিত হবে।

বধ্যভূমি: একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী পুরো বাংলাদেশকেই বধ্যভূমিতে পরিণত করে। তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে লাশগুলো মাটিতে পুঁতে রাখে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বধ্যভূমি আবিষ্কার হচ্ছে। বেরিয়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা কাহিনি। বেদনার বধ্যভূমি খুঁজে বের করতে হবে সাংবাদিকদের। তুলে ধরতে হবে সেসব নির্মমতার কথা।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন স্থাপনা, ভাস্কর্যের বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চাকে বেগবান করা যায়। জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য স্থাপনা। সেসব স্থাপনা নিয়েও প্রতিবেদন, ফিচার তৈরি করতে হবে।

ঢাকার আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য নিদর্শন। জাতীয় জাদুঘরেও আছে মূল্যবান দলিল, নিদর্শন। সেসবের কথা প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে এনে মানুষকে জানাতে হবে। খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেশের একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর। সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মারকচিহ্ন রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার অন্যতম সোর্স হতে পারে এই গণহত্যা জাদুঘর।

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’, ‘আমার দেখা নয়াচীন’ ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল।

বস্তুত বঙ্গবন্ধুর জীবন সবার জন্যই এক শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যেমন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, তেমনই দেশের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এজন্য বাঙালি জাতি চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ইতিহাসের দায়মোচন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দেশের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা জাতি হিসাবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশক পার হলেও সে মহান দায়িত্ব পালন করা যায়নি। যে উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগের মহিমায় মাত্র ৯ মাসের মাথায় একটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করে এ দেশের দামাল ছেলেরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল, ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম আর ৩০ লাখ শহিদের আত্মদানের পর আমরা লাভ করি স্বাধীনতা। সামরিক শক্তির দিক থেকে এক অসম যুদ্ধ হলেও দেশমাতৃকার জন্য বাঙালির সর্বোচ্চ ত্যাগ আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে।

ঢাকার আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য নিদর্শন। জাতীয় জাদুঘরেও আছে মূল্যবান দলিল, নিদর্শন। সেসবের কথা প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে এনে মানুষকে জানাতে হবে। খুলনায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেশের একমাত্র গণহত্যা জাদুঘর। সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মারকচিহ্ন রয়েছে

বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ি মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে প্রামাণ্য ইতিহাসের সাক্ষী। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নির্মম সাক্ষীও এই বাড়ি। এই বাড়ি থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর দেওয়ালে দেওয়ালে ইতিহাস কথা বলে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। এ কারণেই তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সেই ট্র্যাজিক কাহিনি তুলে ধরতে হবে নতুন প্রজন্মের কাছে।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দি করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বন্দি মুজিব আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। রণাঙ্গনে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাই হয়ে উঠলেন একেকজন মুজিব। তাঁর নামেই পরিচালিত হলো মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অবশেষে বাঙালি পেল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার জন্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ, তাঁর লেখা বই, তাঁকে নিয়ে লেখা বই হতে পারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার প্রধানতম সোর্স। তাঁর পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে ডিসেম্বরের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পিছু হটতে থাকে। একে একে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে ১৬ ডিসেম্বর আসে চূড়ান্ত ক্ষণ। হানাদারমুক্ত হয় দেশ। পাকবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পর অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। বস্তুতপক্ষে এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতালাভের পরও থেমে থাকেনি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপপ্রয়াস রুখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র এবং তা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য বিস্তর গবেণার কোনো বিকল্প নেই।

শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করতে হবে–যেখানে সবাই সবার নাগরিক অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে গৌরবের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট; ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ

যুদ্ধ বা সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতা প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনীয়তা

মো. মিনহাজ উদ্দীন

যুদ্ধ বা সংঘাতসংকুল এলাকায় সাংবাদিকতা সহজসরল বা শান্তির কোনো কাজ নয়। এ কাজে পদে পদে বিপদ, মোড়ে মোড়ে মৃত্যুর হাতছানি। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রবেশ করে এরকম বেশ কয়েকটি বড়ো বিপদে পড়েছিলেন ভারতের আনন্দবাজারের সমর-সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেসময় নিতান্তই ভাগ্যগুণে তার প্রাণরক্ষা পায়। এর আগে খুলনা ফ্রন্টে পড়েছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শেলিংয়ের মুখে, তবে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু সবাই সৌভাগ্যবান হন না। বাঙালির রক্তদানের ইতিহাস রচনা করতে এসে প্রাণ দিয়েছেন দুজন ভারতীয় ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। তারা হলেন দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরজিৎ ঘোষাল। 'ডেটলাইন ঢাকা' নামক স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে ১৯৭১ সালে প্রাণ বিসর্জনকারী এই দুই সাংবাদিকের জন্য শোকগাথা লিখেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন রণাঙ্গনের সাংবাদিকতা নিয়ে তার দার্শনিক বিশ্লেষণ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> *'যুদ্ধজয় শেষে অস্ত্রধারী সৈনিকরা পাবেন নানান সেবা পদক, কেউ পাবেন পদ্মশ্রী, কেউ পদ্মভূষণ, যারা নিহত হবেন তাদের জন্য নির্মিত হবে সৌধ। কিন্তু সাংবাদিক–যিনি সৈনিকের পাশে থেকে তাঁর বীরত্বগাথা রচনা করছেন, দুনিয়ার মানুষকে জানাচ্ছেন যুদ্ধ সংবাদ, যিনি জনমত গঠন করছেন, স্তিমিত উদ্যমহীন এক মুমূর্ষু জাতির হৃদয়ে জ্বেলে দিচ্ছেন উদ্দীপনার জ্বলন্ত মশাল–বিজয় উৎসবের মঞ্চে তাঁর কোনো স্থান নেই।' (ডেটলাইন ঢাকা, পৃ. ৩৫)*

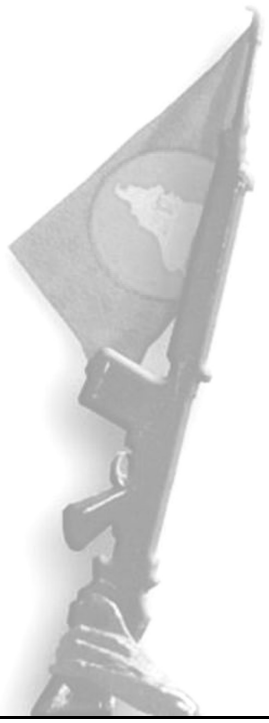

১৯৭১ সালে নিজের জীবন বিপন্ন করা একজন পার্থ চট্টোপাধ্যায় হয়তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়মঞ্চে স্থান পাননি; কিন্তু তিনি যে অনবদ্য অবদান রেখেছেন, তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অমূল্য।

জগৎসংসার দ্বন্দ্বমুখর। দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছাড়া পৃথিবী অকল্পনীয়। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই নানা রকম দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি বিরাজমান, যা থেকে ঘটছে সংঘাত, সহিংসতা, প্রাণহানি। অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। যে যুদ্ধ কাভার করতে গিয়ে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যুদ্ধের কাভারেজ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। এদিকে বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশকে প্রায় ১১-১২ লাখ রোহিঙ্গাকে নিয়ে এক বিশেষ দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। যার পেছনে আছে রাখাইনে জাতিগত সংঘাত-সহিংসতার এক দীর্ঘ ইতিহাস। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়ায় চলছে বহুমুখী দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। কয়েক বছর ধরে টানা গৃহযুদ্ধ চলছে দেশটিতে। সংঘাত চলছে ইয়েমেনে। এসব দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এতটায় জটিল-সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে, অনেক সময় বিশ্ব গণমাধ্যমও খেই হারিয়ে ফেলে কে

কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সেই বিষয়টি নিশ্চিত হতে। বর্তমান সময়ের আলোচিত তাত্ত্বিক ম্যাক্স লুকাডো (Max Lucado) যুদ্ধ ও সংঘাত সম্পর্কে বলেছেন 'Conflict is inevitable but combat is optional'. লুকাডোর এই কথাটি সত্যিই ভাবনার উদ্রেক করে। বিশ্বব্যবস্থায় পুরোপুরি দ্বন্দ্ব নিরসন সত্যিই কঠিন তবে যুদ্ধ করাটা ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

যুদ্ধে প্রথম নিহত হয় সত্য (The first casualty of War is Truth)

যুদ্ধ শুধু রণাঙ্গনেই হয় না, যুদ্ধের আরেকটি বড়ো ক্ষেত্র হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশিত তথ্যের দ্বারা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। অনেক সময় প্রভাবশালী দেশগুলো ভুল তথ্য ব্যবহার করে, মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে যুদ্ধজয় করে। তাই অবধারিতভাবেই বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের অন্যতম প্রয়োজনীয় অস্ত্র হলো তথ্য (Information)। আর যুদ্ধকালীন তথ্য বা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নিয়ে চলে নানারকম রাজনীতি, কূটনীতি বা সমরনীতি। যার চাপে পড়ে প্রথমেই যে বিষয়টি নিহত হয়, প্রাণ হারায়–সে বিষয়টি হলো 'সত্য'। যাকে তাত্ত্বিকরা ব্যাখ্যা করেছেন 'The first casualty of War is Truth' শব্দযুগলের মাধ্যমে।

'The first casualty of War is Truth' শব্দযুগল প্রথম ব্যবহার করেন হিরাম ওয়ারেন জনসন (Hiram Warren Johnson)। ক্যালিফোর্নিয়ার এই সিনেটর ১৯১৭ সালে প্রথম এই বাক্যটি ব্যবহার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কারণ, যুদ্ধকালীন তথ্যের নানাবিধ অপব্যবহার নিয়ে সবাই অবগত ছিলেন; কিন্তু জনসনের আগে কেউ এত স্পষ্ট করে যুদ্ধ ও সত্য সম্পর্কে এমন নির্জলা সত্য কেউ উচ্চারণ করেননি। সাম্প্রতিক সময়ে নানা ঘটনাপ্রবাহে জনসনের কালজয়ী এই উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন: মিয়ানমারের রাখাইনে সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজমান। যার সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব সহ্য করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। রাখাইনে ২০১৭ সালের শেষদিক থেকেই একধরনের যুদ্ধপরিস্থিতি। এই যুদ্ধে মূলত দুটো পক্ষ: ক. মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও প্রশাসন; খ. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। চলমান এই সংঘাতে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র সংগঠন আরসার (ARSA: Arakan Rohingya Salvation Army) উসকানিমূলক আক্রমণ কতটা সত্য, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিপীড়ন কতটা সত্য, তা নিয়ে চলছে পালটাপালটি যুক্তিতর্ক। এরপর রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, হত্যাকাণ্ড, দেশত্যাগে বাধ্য করা প্রভৃতি নানা বিষয়ে চলছে নানা রকম দাবি আর পালটা দাবি। হিরাম ওয়ারেন জনসনের ভাষায় বলা যায়, এখানে প্রথম নিহত হয়েছে 'সত্য'।

তবে ভুলে গেলে চলবে না সত্যই (Truth) সাংবাদিকতার মূল শক্তি। সত্যকে উদ্‌ঘাটন এবং তা তুলে ধরাই সাংবাদিকের মূল দায়িত্ব। আর কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই সত্যের আলোকে সাংবাদিককে পালন করতে হয় আরও গুরুদায়িত্ব। এ সময় একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিককে পুরো ঘটনাকে মানবিকীকরণ (Humanize) প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে হয়। যার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় সবার অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি। এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমে অমানবিকীকরণ (De-humanize) খুবই ভয়ংকর হতে পারে, যা উসকে দিতে পারে গণহত্যার মতো ভয়ংকর অপরাধ। যেমন: রুয়ান্ডা জেনোসাইড (১৯৯০-১৯৯৪)। যাতে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ থেকে ১০ লাখ তুতসি। এই হত্যাকাণ্ড সাধারণত তুতসি জনগোষ্ঠী জেনোসাইড নামেও পরিচিত। রুয়ান্ডায় এই জাতিগত নিধনের সময় ফরাসি ভাষার সাময়িকী 'কানগুরা'তে তুতসিদের লক্ষ করে প্রকাশ করা হয় ঘৃণা প্রকাশক অনেক প্রতিবেদন; যাতে তাদেরকে চিত্রিত করা হয় 'তেলাপোকা' ও 'সাপ' হিসাবে। অন্যদিকে রুয়ান্ডায় RTLM-Radio Television Libre des Mille Collines নামের একটি রেডিয়ো উন্মাদনা ছড়িয়ে জেনোসাইড সংঘটিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই রেডিয়োতে বারবার বিভিন্নভাবে ঘোষণা করা হয় তুতসিরা তেলাপোকা (Cockroaches)। তাদের হত্যা করা একান্ত কর্তব্য। এই রেডিয়োতে ১৯৯৪ সালের ১২ এপ্রিল সম্প্রচারিত এক বার্তায় হুতু জেনারেল কানটানো হাবিমানা (Kantano Habimana) বলেন, "And you people who live... near Rugunga...go out. You will see the cockroaches' (inkotanyi) straw huts in the marsh.... I think that those who have guns should immediately go to these cockroaches... encircle them and kill them..." কী ভয়ংকর উচ্চারণ, যা নিশ্চিতভাবেই ত্বরান্বিত করেছিল ভয়ংকর এক জেনোসাইড।

এমন বাস্তবতায় সারা বিশ্বে সংঘাত-সংবেদনশীল সাংবাদিকতা (Conflict Sensitive Journalism) নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ চলছে। গণমাধ্যম যাতে কোনোভাবেই কোনো যুদ্ধপরিস্থিতিকে উসকে দিয়ে আরও ধ্বংস ডেকে না আনে, সেজন্য চলছে নানা ধরনের একাডেমিক আলোচনা। এমনই একটি আলোচনা করেছেন গবেষক রস হাওয়ার্ড (Ross Howard)। তিনি তার 'Conflict Sensitive Journalism' হ্যান্ডবুকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি কোনো যুদ্ধপরিস্থিতিতে সঠিক সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সেগুলো হলো:

ক. **সঠিকতা বজায় রাখা (Accuracy):** সঠিকতা সাংবাদিকতার বড়ো সম্পদ। কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত তথ্য দেওয়া থেকে না দেওয়া ভালো। বলা হয়, A good journalist will rush to get the news first. But first, the journalist must get it right. অর্থাৎ একজন ভালো সাংবাদিক সবার আগে সংবাদ সংগ্রহ বা পাওয়ার চেষ্টা করেন, তবে প্রথমেই সাংবাদিককে ঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যদি তা না হয়, তাহলে বড়ো ধরনের ভুল হতে পারে। যেমন: প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯০-৯১) অপারেশন ডেজার্ট স্ট্রমের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী বাগদাদের একটি কারখানায় হামলা চালায়। ওই হামলা চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে এটি ছিল একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা। কিন্তু পরে জানা যায়, এটি ছিল শিশুদের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি কারখানা। অনেক গণমাধ্যম যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সরবরাহকৃত সংবাদটি প্রচার বা প্রকাশ করে, যা ছিল মিথ্যা। এই মিথ্যার মাধ্যমে শিশুদের জন্য খুবই জরুরি একটি কারখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল; কিন্তু তারপরও জনমত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে।

খ. **নিরপেক্ষতা বজায় রাখা (Impartiality):** প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে কারও পক্ষ নেওয়া সাংবাদিকের কাজ নয়। সাংবাদিককে অবশ্যই তার জাতীয়তা, জাত, ভালোলাগা, মন্দলাগার ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষতার সঙ্গে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করতে হবে। এখানে কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ নেই। সংবাদ হতে হবে নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ। মনে রাখতে হবে, Journalist-এর Activist হওয়ার সুযোগ নেই। যেমন: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে একধরনের সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ১০-১৫ বছর একধরনের শান্তির

পরিবেশ বিরাজ করে। কিন্তু সম্প্রতি আবার পাহাড় অশান্ত হয়ে ওঠছে। এখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সমতলে অবস্থিত এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি। তাই প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সমতল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি একধরনের পক্ষপাত চলে আসতে পারে, যা থেকে বিরত থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরাই সাংবাদিকের কর্তব্য।

গ. **দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা (Responsibility):** যুদ্ধ-সংঘাত পরিস্থিতিতে একজন সাংবাদিক হবেন দায়িত্বশীল। সংবাদ হবে বস্তুনিষ্ঠ। মনে রাখা ভালো, একজন চিকিৎসকের হাতে ছুরি আর একজন ছিনতাইকারীর হাতের ছুরির ব্যবহার এক নয়। চিকিৎসক প্রাণ বাঁচাতে ছুরি ব্যবহার করেন। আর ছিনতাইকারী অন্যের প্রাণনাশ করতে। তাই মনে রাখতে হবে, একজন অপপ্রচারকারীর (Propagandist) কাছেও যেমন তথ্য থাকে, তেমনই একজন সাংবাদিকও (Journalist) নানা উৎস থেকে তথ্য পেয়ে থাকেন। পার্থক্য শুধু তথ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে। কীভাবে সাংবাদিক তথ্য ব্যবহার করে উত্তেজিত পরিস্থিতিকে শান্ত করার চেষ্টা করবেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনে রাখতে হবে, উসকানি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা (Reliable Journalism)

বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বড়ো বিষয়। একজন পাঠক সেই পত্রিকাই বাড়িতে রাখেন, যে পত্রিকার সংবাদ তিনি বিশ্বাস করেন। দায়িত্বশীলতার মাধ্যমেই এই আস্থা অর্জন করতে হয়। ২০০১ সালে ইরাক যুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের বিবিসি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিএনএন-এর অনেক ইস্যুতে তাদের প্রতি মুসলিম বিশ্বের দর্শকরা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল। যে শূন্যস্থান দখল করে নেয় নতুন চ্যানেল আলজাজিরা (উপদ্বীপ)। যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বকালীন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন খুবই জরুরি, যা অর্জন সম্ভব দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে। রস হাওয়ার্ড (Ross Howard) বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা (Reliable Journalism) ক্ষেত্রে একটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন, যা অনেকটা এরকম:

ঠিক তথ্য + নিরপেক্ষতা + দায়িত্বশীলতা = বিশ্বাসযোগ্যতা
Accuracy + Impartiality + Responsibility = Reliability

সংঘাত বুঝুন, সহমর্মিতা নয়: জেন সিয়েটন

জেন সিয়েটন (Jean Seaton) যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া হিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি গণমাধ্যম নিয়ে নানা ধরনের গবেষণায় যুক্ত। তিনি War and the Media. Reporting Conflict 24/7 (2003) বইয়ে 'Understanding of Empathy' চ্যাপ্টারে (পৃ. ৪৫-৫৪) যুদ্ধসময়ের সাংবাদিকতা নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি যুদ্ধদিনের সাংবাদিকতার স্বরূপ নির্ধারণে বলেছেন, 'News is one of the great political and artistic forms animating contemporary collective and private lives and it deals with how we understand our condition. Violent news can be awesome and its bitter sights addictive.' অর্থাৎ সংবাদ একধরনের অসাধারণ রাজনৈতিক ও নান্দনিক কাঠামো, যার মাধ্যমে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবন প্রভাবিত হতে পারে। সংবাদ সাধারণত আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে সহযোগিতা করে। সংঘাত-সহিংসতার সংবাদ খুবই ভালো; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটা একধরনের আসক্তি।

নিকোলাস নুজেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি (Nicholas Nugent Outlook)

নিকোলাস নুজেন্ট একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক, প্রশিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন বিবিসিতে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখান থেকে এডিটর পদে অবসর নেওয়ার পর তিনি বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করে আসছেন। ভূমিকা রাখছেন পরামর্শক হিসাবে। নিকোলাসের আগ্রহের বিষয় 'Conflict Sensitive Journalism'। পেশাগত জীবনে তিনি নিজে যেমন বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বসংকুল ঘটনাপ্রবাহ কাভার করেছেন, আবার জ্যেষ্ঠ সংবাদকর্মী হিসাবে তিনি বিবিসিতে চাকরির সময় অন্য সাংবাদিকদের এ বিষয়ে সফল হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন।

২০১৮ সালের মে মাসে নিকোলাস বাংলাদেশের বিএনএনআরসি (বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিয়ো অ্যান্ড কমিউনিকেশনস) ও ইন্টারনিউজের আয়োজনে 'Conflict Sensitive Journalism' নিয়ে একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন। দুই দিনের ওই কর্মশালায় তিনি এ বিষয়ে নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনা গবেষক হাওয়ার্ডের আলোচনার সঙ্গে অনেকটা সংগতিপূর্ণ।

এছাড়াও নিকোলাস যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়বিশেষ গুরুত্ব দেন। সেগুলো হলো:

ক. মূল্যবোধ (Values)
খ. শব্দচয়ন (Vocabulary)
গ. পক্ষপাতিত্ব (Bias)
ঘ. নিরাপত্তা (Safety)

এছাড়া Conflict Sensitive Journalism-এ আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন নিকোলাস।

কারও ক্ষতি না করা (Do not Harm)

যুদ্ধ বা সংঘাতকালীন সাংবাদিকতায় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধ বা সংঘাতকালীন কোনো সাংবাদিকের প্রতিবেদন যাতে কোনো অবস্থাতেই অন্য কারও ক্ষতি না করে। আর ভিকটিম বা যিনি অপরাধের শিকার তার সুরক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। নিকোলাস নুজেন্ট ওই কর্মশালায় বারবার উল্লেখ করেছেন যুদ্ধ বা সংঘাতকালীন অবশ্যই যিনি সাক্ষাৎকার বা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করছেন তার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। তার নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। একজন প্রতিবেদককে কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকারদাতার জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে।

তথ্যসূত্র

১. http://www.newtimes.co.rw/section/read/73836
২. Kisnan, Daya, Freeman, Des, (2003) *War and the Media. Reporting Conflict 24/7,* Delhi: Vistaar Publications.
৩. Interview (2017), Nicholas Nugent
৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০১৮), *ডেটলাইন ঢাকা।* ঢাকা: বিপিএল
৫. *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কলকাতার সাংবাদিক, কলকাতা প্রেস ক্লাব* (২০১৯) সংকলন ও সম্পাদনা: স্নোহাশিস সুর, প্রকাশক (ঢাকা): মুহম্মদ শফিকুর রহমান, এমপি

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ '৭১: বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

শুভ কর্মকার

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির দীর্ঘকালের স্বপ্ন ও আশার সূর্যোদয় ঘটে। হাজার বছরের বঞ্চনা ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এবং শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে কথা বলতে সক্রিয় ছিল তৎকালীন সংবাদপত্র। ১৯৪৭-১৯৭১ সালের পত্রিকাগুলো বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণ এবং ক্রম অগ্রসরমান রাজনৈতিক আন্দোলনে জনমতকে স্বাধীনতাসংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা পালন করেছে (জাহান, ২০০৮)। বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশি গণমাধ্যমও বিশ্বজনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিদেশি গণমাধ্যমগুলোর পরিবেশিত সংবাদের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ, নৃশংস বর্বরতা, শরণার্থীদের করুণ জীবনযাপন ও দুর্ভোগের কাহিনি বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত তৈরিতে বিশ্ব গণমাধ্যমগুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই প্রবন্ধে ১৯৭১ সালের মার্চে বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত সংবাদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সংবাদগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

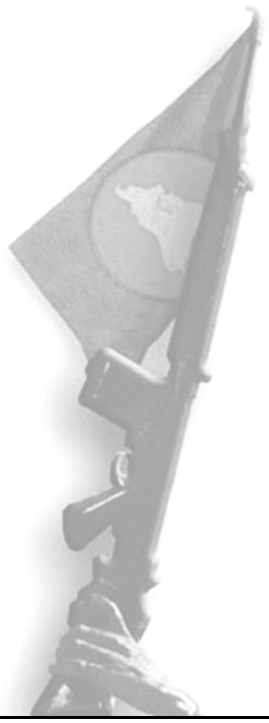

যুদ্ধ শুরুর আভাস

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ *নিউইয়র্ক টাইমসের* সম্পাদকীয় পাতার শিরোনাম ছিল 'রায়টস ইন পাকিস্তান'[১]। মূলত ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই অবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করে *নিউইয়র্ক টাইমস* এই সংবাদ পরিবেশন করে। একইভাবে ৭ মার্চের ভাষণের খবর *নিউইয়র্ক টাইমস* গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করে। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করতে পারে'[২]। সংবাদটিতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার বাধার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের সমর্থকরা আশা করছে, তিনি আগামীকালের জনসভা থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। (জাহিদ, ২০২১)

সাতই মার্চের ভাষণের পর বিদেশি গণমাধ্যমগুলো বুঝতে পারে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) 'কিছু' একটা ঘটতে চলেছে। বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদেও তা সুস্পষ্ট। ১১ মার্চ ১৯৭১ *নিউইয়র্ক টাইমসের* প্রতিবেদনে বিশেষ সংবাদদাতা টিলম্যান ডুরডিন লিখেন, 'পূর্ব পাকিস্তান মনে করে শাসকেরা তাদের আগের মতো উপনিবেশ হিসেবেই আচরণ করছে'[৩]। (জাহিদ, ২০২১)

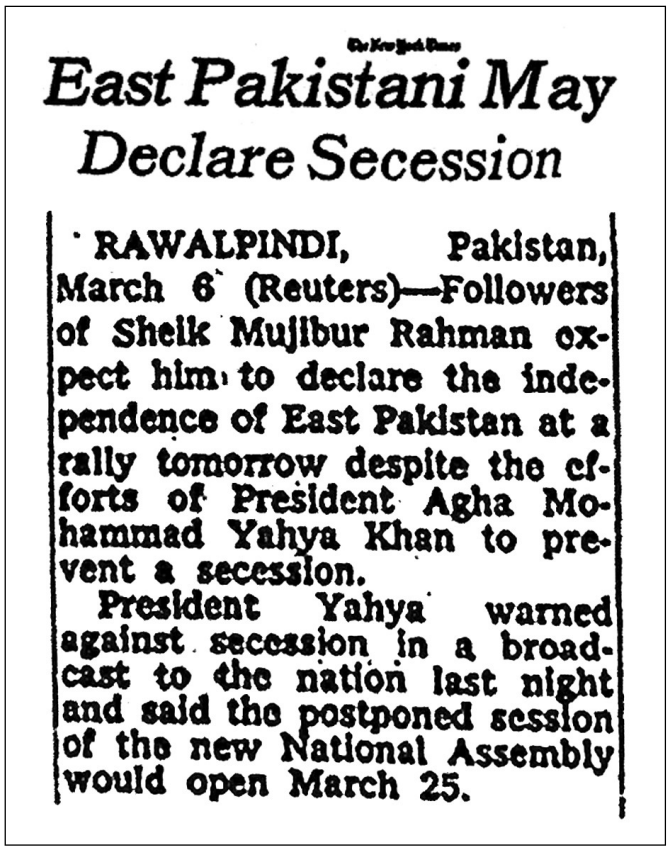

The New York Times

East Pakistani May Declare Secession

RAWALPINDI, Pakistan, March 6 (Reuters)—Followers of Sheik Mujibur Rahman expect him to declare the independence of East Pakistan at a rally tomorrow despite the efforts of President Agha Mohammad Yahya Khan to prevent a secession.

President Yahya warned against secession in a broadcast to the nation last night and said the postponed session of the new National Assembly would open March 25.

চিত্র ১.১: *নিউইয়র্ক টাইমস*, যুক্তরাষ্ট্র, ৭ মার্চ ১৯৭১ (জাহিদ, ২০২১)

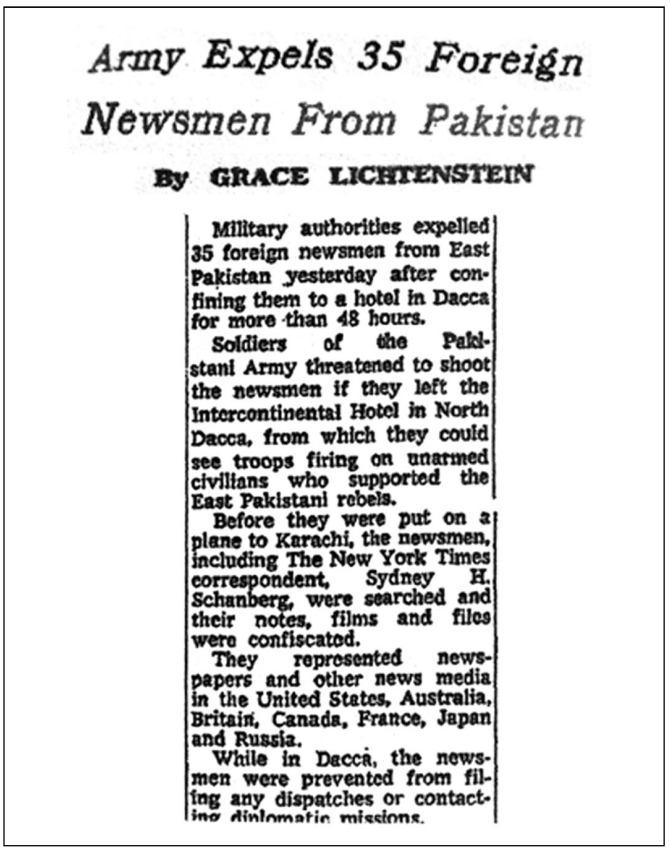

Army Expels 35 Foreign Newsmen From Pakistan

By GRACE LICHTENSTEIN

Military authorities expelled 35 foreign newsmen from East Pakistan yesterday after confining them to a hotel in Dacca for more than 48 hours.

Soldiers of the Pakistani Army threatened to shoot the newsmen if they left the Intercontinental Hotel in North Dacca, from which they could see troops firing on unarmed civilians who supported the East Pakistani rebels.

Before they were put on a plane to Karachi, the newsmen, including The New York Times correspondent, Sydney H. Schanberg, were searched and their notes, films and files were confiscated.

They represented newspapers and other news media in the United States, Australia, Britain, Canada, France, Japan and Russia.

While in Dacca, the newsmen were prevented from filing any dispatches or contacting diplomatic missions.

চিত্র ১.২: *নিউইয়র্ক টাইমস*, ২৮ মার্চ ১৯৭১ (জাহিদ, ২০২১)

গণহত্যা ও সেন্সরশিপ

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বিদেশি সাংবাদিকদের বাংলাদেশ (পূর্ব বাংলা) থেকে চলে যেতে বলা হয়। আর মুক্তিযুদ্ধের শুরু হলে দৈনিক সংবাদ-এর বংশাল রোডের বাড়িটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয় ইত্তেফাকের প্রকাশনা। ফলে সাংবাদিকদের আড়ালেই ধ্বংসযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তবে এমন পরিস্থিতিতে বিদেশি সাংবাদিকদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। (মৈত্র, ২০১৯)

বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো সাংবাদিকদের বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) পাঠাতে শুরু করে। বিদেশি সাংবাদিকদের বেশির ভাগই তৎকালীন শাহবাগের ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি জান্তা সরকার পূর্বপরিকল্পিতভাবে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হামলা করে এবং ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। গণহত্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ পাকিস্তানি জান্তা সরকার আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান থেকে আগত প্রায় ৩৭ জন সাংবাদিককে হোটেলে অবরুদ্ধ করে রাখে। সাংবাদিকদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে দেশত্যাগের (বাংলাদেশ) নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হোটেলের ছাদে উঠে আবার কেউ রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়ে খবর সংগ্রহ করেন। (দেব, ২০২০)

তবে সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন আছে। উল্লিখিত তথ্যসূত্রে ৩৭ জন সাংবাদিকের কথা বলা হলেও *নিউইয়র্ক টাইমসের* একটি প্রতিবেদনে ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৮ মার্চ ১৯৭১ গ্রেস লিইচম্যানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে *নিউইয়র্ক টাইমস*। সংবাদটির শিরোনাম ছিল '৩৫ বিদেশি সাংবাদিককে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করেছে সেনাবাহিনী'[৪]। এই সংবাদে উল্লেখ করা হয় *নিউইয়র্ক টাইমসের* সংবাদদাতা সিডনি এইচ শ্যানবার্গসহ সব সাংবাদিককে বারবার তল্লাশি করা হয় এবং তাদের নোট, ফিল্ম ও ফাইল জব্দ করা হয়। (জাহিদ, ২০২১)

২৬ মার্চ কলকাতার আকাশবাণী, বিবিসিসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম গুরুত্বসহকারে গণহত্যার খবর প্রচার করতে থাকে (দেব, ২০২০)। তবে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহ করতে না দেওয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে ঘটে যাওয়া গণহত্যা সম্পর্কে মানুষকে অন্ধকারে রাখতে কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করা হয় সংবাদপত্রের ওপর। সেন্সরশিপের বিষয়টি বিশ্ববাসীকে জানাতে ভুল করেনি বিশ্ব গণমাধ্যমগুলো। ২৭ মার্চ বিবিসি বাংলার সংবাদে বলা হয়, 'কড়া সেন্সরশীপের (সেন্সরশিপের) কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সঠিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না'। সংবাদে আরও বলা হয়, 'বিবিসির সংবাদদাতা ক্লেটনকে ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশত্যাগের আগে বিবিসির সংবাদদাতা ও তার ক্যামের ক্রু'র ফিল্ম, কাগজপত্র সব জব্দ করা হয়। তাদের তিনবার সার্চ করা হয়। তিনি বলেন কোনভাবেই যাতে সঠিক খবর বাইরে না যায় সে ব্যাপারে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ মরিয়া। সংবাদদাতা ক্লেটন আরও জানান নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তানী নেতা শেখ মুজিবকে বন্দী করা সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের দাবী সম্ভবত সঠিক।' (আনোয়ার, ২০১১)

একই দিনে *ডেইলি টেলিগ্রাফের* প্রতিবেদক ডেভিড লোসাক নয়াদিল্লি থেকে একটি প্রতিবেদন পাঠান। প্রতিবেদনটি ২৭ মার্চ *ডেইলি টেলিগ্রাফে* প্রকাশিত হয়। সংবাদটির শিরোনাম ছিল: 'পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের অগ্নিতরঙ্গ, ... শেখ একজন বিশ্বাসঘাতক, প্রেসিডেন্টের বক্তব্য'[৫]। সংবাদে উল্লেখ করা হয়, *ডেইলি টেলিগ্রাফের* সংবাদদাতা

সায়মন ড্রিংসহ বিদেশি সংবাদদাতাদের হোটেল থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি। (জাহিদ, ২০২১)

স্বাধীনতার ঘোষণা ও 'গৃহযুদ্ধ'

২৬ মার্চ বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একাত্তরের ২৬ মার্চ ভোর থেকে কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে বারবার প্রচার করা হতে থাকে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। বারবার ঢাকার ঘটনাগুলো প্রচার করতে থাকে। (মৈত্র, ২০১৯)

২৬ মার্চ বিবিসি বাংলার এক খবরে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তানে তুমুল যুদ্ধের খবর পাওয়া গেছে। সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইয়াহিয়ার আদেশে এই লড়াই শুরু হয়। ওদিকে ভারত থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন'। (দেব, ২০২০)

দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে। অস্ট্রেলিয়ার পত্রিকা *দ্য এজ* ২৭ মার্চ 'ঢাকা পাকিস্তান থেকে ভেঙে বেরিয়ে গেছে'[৬] শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশন করে। এই সংবাদেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার উল্লেখ পাওয়া যায়। সংবাদটিতে স্বাধীনতার ঘোষণার ওয়্যারলেস বার্তার কথা উল্লেখ রয়েছে। (জাহিদ, ২০২১)

THE DAILY TELEGRAPH

SATURDAY, MARCH 27, 1971

135, FLEET STREET, LONDON, E.C.4.

TEL.: 01-353 4242. TELEX: 22874/5/6.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS: 01-583 8939.

PAKISTAN'S CIVIL WAR

WHAT HAS LONG BEEN FEARED for the world's largest, but deeply divided, Moslem nation has finally materialised in the outbreak of civil war in East Pakistan. With President YAHYA KHAN's departure from Dacca, the provincial capital, after abortive endeavours to resolve the constitutional impasse, large-scale fighting flared up yesterday between the West Pakistani army and the supporters of the Eastern province's undisputed political leader, Sheikh MUJIBUR RAHMAN. Separation is in the very fabric of the State of Pakistan. Not only are the Western and Eastern wings separated by 1,000 miles of Indian territory; they are just as much divided economically, socially and culturally. Although East Pakistan has 60 per cent. of the population and is the major producer, it is subservient to West Pakistan, which largely mans the central bureaucracy, the army and the business community.

The inequality extends to foreign aid and imports and

চিত্র ১.৩: *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ*, ইংল্যান্ড, ২৭ মার্চ ১৯৭১ (জাহিদ, ২০২১)

লন্ডনের *দ্য অবজারভার* ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একাধিক সংবাদ পরিবেশন করে। এর মধ্যে একটি সংবাদে প্রকাশ করা হয়, 'রাশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে। মস্কো উপলব্ধি করতে পেরেছে, পরাশক্তিগুলো যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তবে পাকিস্তানের গণহত্যা বন্ধ হতে পারে।' আবার সংবাদপত্রগুলোয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান নিয়ে পরস্পরবিরোধী খবর পাওয়া যায়। পাকিস্তানি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, শেখ মুজিবকে ঢাকায় নিজ বাসভবনে আটকে রেখেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, তিনি চট্টগ্রামে রয়েছেন। (দেব, ২০২০)

তবে বিপরীত দিকও দেখা যায়, বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ হিসাবেও দেখিয়েছে *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ*। ২৭ মার্চ লন্ডনের *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* 'পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ'[৭] শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। (জাহিদ, ২০২১)

পাকিস্তানিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও প্রতিরোধ

বিবিসি প্রচারিত ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ একটি সংবাদে পাকিস্তান বেতারের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়, 'ঢাকার পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। দোকানপাট, ব্যাংক খুলছে। কারফিউ যেমনটা রবিবার উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল আজও উঠিয়ে নেয়া হবে।' পাকিস্তানি গণমাধ্যম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো লুকিয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করলেও বিদেশি গণমাধ্যমগুলো এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়, 'ঢাকায় আক্রমণ চলছে। গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং আগুন জ্বলছে। মুক্তিবাহিনী উত্তরাঞ্চলীয় শহর রংপুর পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে লড়াই করে দখল করেছে।' (আনোয়ার, ২০১১, পৃ. ১৬)

কলকাতার মতো সায়মন ড্রিংয়ের পাঠানো প্রতিবেদনেও একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। *সানডে টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় সায়মন ড্রিং ২৮ মার্চ ঢাকা থেকে একটি সংবাদ পাঠান। *সানডে টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদের শিরোনোম ছিল: 'সারা রাত গোলাবর্ষণ শেষে সেনারা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে'[৮]। সায়মন ড্রিং এই প্রতিবেদনে বলেন, 'শুক্রবার সারা রাত যত্রতত্র গোলাবর্ষণের পর ইয়াহিয়ার বাহিনী সাময়িকভাবে হলেও বড়ো শহরগুলোর দখল নেয়। সকালেও অনেক দালানে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। দিনেও গোলাবর্ষণ অব্যাহত আছে। সেনাবোঝাই লরিগুলোকে চলতে দেখা যায়। হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরি এলাকা থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যায়। সাংবাদিকদের হোটেল থেকে বের না হতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কেউ ভবন থেকে বের হলে গুলি করা হবে বলে হুঁশিয়ার করা হয়।' *সানডে টেলিগ্রাফ* ২৮ মার্চ ঢাকার অবস্থা নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 'দ্য ভিকটিমস'[৯] শিরোনামে। (জাহিদ, ২০২১)

সানডে টাইমস ২৮ মার্চ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে একটি সংবাদ পরিবেশন করে। সংবাদটি নয়াদিল্লি থেকে ডেভিড লোসাক প্রেরণ করেন। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানি বোমারু বিমানের বিদ্রোহী শহরে আঘাত, গভর্নর গুলিবিদ্ধ'[১০]। সংবাদটিতে কুমিল্লা শহরে বোমাবর্ষণ ও ১০ হাজার মানুষকে হত্যার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। (জাহিদ, ২০২১)

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড ২৯ মার্চ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল 'বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত'[১১]। *দ্য এজ* সম্পাদকীয়তে লিখে 'পাকিস্তানে দুঃখজনক ঘটনা'[১২]। *দ্য এজে* এইদিন 'ট্যাংক যখন আলোচনার দখল নেয়'[১৩] শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। হত্যার খবরের পাশাপাশি ২৯ মার্চ প্রকাশিত *নিউইয়র্ক টাইমসের* প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রতিরোধের খবর পাওয়া যায়। বিশেষ

সংবাদদাতা সিডনি এইচ শ্যানবার্গ ২৮ মার্চ সংবাদটি পাঠান এবং ২৯ মার্চ প্রকাশিত হয়। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'ট্যাংকের বিরুদ্ধে লাঠি ও বল্লম'[১৪]। (জাহিদ, ২০২১)

পাদটীকা

1. Riots in Pakistan
2. East Pakistani May Declare Secession
3. East Pakistan think regime treats them as colony of old
4. Army Expels 35 foreign newsman from Pakistan
5. Civil war flares in E. Pakistan- Sheikh 'a traitor' says President
6. Dacca breaks with Pakistan
7. Pakistan's civil war
8. Army take over after night of shelling
9. The Victims
10. Pakistani bombers 'hit rebel town'- Governor shot
11. Plunge into Chaos
12. Pakistan tragedy
13. When tanks took over the talking
14. Sticks and Spears against Tanks

তথ্যসূত্র

* আনোয়ার, কবির বিন (২০১১)। *বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম: দ্বিতীয় খণ্ড*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স।
* দেব, পার্থ সারথী (২০২০)। মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি গণমাধ্যমের ভূমিকা। *প্রথম আলো*। Retrieved from: https://www.prothomalo.com/world/usa/মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি গণমাধ্যমের ভূমিকা, on 18 June 2022
* মৈত্র, রণেশ (২০১৯)। মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যম। ভোরের কাগজ। Retrieved from: https://www.bhorerkagoj.com/2019/02/15/মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যম/, on 18 June 2022
* জাহিদ, আবদুল্লাহ (২০২১)। *বিশ্বসংবাদপত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ*। ঢাকা: বাতিঘর।

লেখক: প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা

রীতা ভৌমিক

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। ফলে এর ইতিহাস ও উপকরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। প্রান্তিক পর্যায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে এনে তৈরি করা যেতে পারে অনেক প্রতিবেদন। এক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদক মুক্তিযুদ্ধের কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবেন, প্রথমে দরকার এর একটি গাইডলাইন তৈরি করা।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রিপোর্ট লেখার কলাকৌশল

প্রিন্ট জার্নালিজম বা মুদ্রণ সাংবাদিকতা, ইলেকট্রনিক জার্নালিজম বা টিভি সাংবাদিকতায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রিপোর্ট তৈরির তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিককে কয়েকটি নির্দেশাবলি মানতে হয়: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা। কারণ, তিনি যেন আবেগের বশে ভুল তথ্যকে গুরুত্ব না দেন। তথ্যের সত্যতার নির্ভরতা রয়েছে কি না, তা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত একাত্তর-বাহাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন রিপোর্টগুলো দেখা। শরণার্থীশিবির, গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর, বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, প্রত্যক্ষদর্শী, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, শহিদপরিবারের সদস্য ও ভুক্তভোগীদের মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ করা। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক দলিলপত্রাদি থাকলে তা সংগ্রহ করা। প্রত্যক্ষদর্শী বা শহিদপরিবারের সদস্যদের কাছে গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহিদ ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির নাম-পরিচয় এবং গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন করা। এরপর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রিপোর্ট তৈরি করা। তার রিপোর্টের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ভুল তথ্যের বিভ্রান্তি থেকে পাঠককে মুক্ত করতে হবে। পাঠককে সঠিক তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে। তথ্য বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। তাহলেই প্রতিবেদনটি তথ্যনির্ভর, গবেষণালব্ধ হবে।

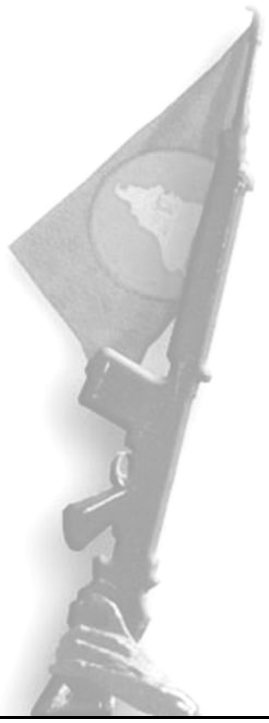

বিদেশি সাংবাদিকরা একাত্তরের এপ্রিলে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের পত্রিকা অফিসগুলো পাকিস্তানি সেনারা জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসের পর যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে আর কোনো সরেজমিন প্রতিবেদন হয়নি। তবে বিদেশি কয়েকটি পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খণ্ড খণ্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাদের অনেকেরই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব দেশে থাকতেন। তাদের সঙ্গে বাংলা বার্তা বিভাগের সহকর্মীরা যোগাযোগের চেষ্টা করতেন বিভিন্ন উপায়ে। সেসব তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্টগুলো তৈরি হয়।

আবার অনেক বিদেশি সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলো প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে। সেসব প্রতিবেদন, আলোকচিত্র ও ভিডিয়ো ফুটেজ কেবল বাংলাদেশের বিজয়কে ত্বরান্বিতই করেনি, সময়ের পরিক্রমায় তা হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের কেউ কেউ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্যাতনের শিকার হন। অনেকে শাহাদতবরণ করেছেন। এরপরও পত্রিকায় কূটনৈতিক তৎপরতা, শরণার্থীশিবিরের অবস্থা, বিশ্লেষণ এবং সম্পাদকীয়তেও অনেক তথ্য উঠে আসে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তথ্য ভারতের কলকাতা থেকে বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা–আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার প্রভৃতিতে বের হতো। এই পত্রিকাগুলোয় বাংলাদেশের যুদ্ধের খবরাখবরই ছিল মুখ্য। তবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতার স্বাভাবিক নিয়মে যেভাবে খবর যাচাই-বাছাই করতে হয়, তখন সেরকম পরিস্থিতি ছিল না। তাই কোনো কোনো খবরে ঘটনার বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ হলেও স্থানের নাম, শহিদের সংখ্যা, শহিদের নামের কিছুটা ভুলভ্রান্তি থেকেই গিয়েছিল। এরপরও সাংবাদিকরা জীবন বাজি রেখে সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রাণপাত চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে এই রিপোর্টগুলোয় তথ্যনির্ভরতা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিবিসি নিয়মিত অবরুদ্ধ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে খবর ও বিশ্লেষণ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্ট তৈরি করতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়। এর কারণ, ঘটনাসংশ্লিষ্ট অনেক প্রত্যক্ষদর্শী, মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে নেই। তাদের মধ্যে অনেকের স্মৃতিভ্রম হয়েছে। অনেকে অসুস্থ। দলিলদস্তাবেজও নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে একজন রিপোর্টারকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের নানা দিকগুলো আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে নেওয়া দরকার। সেই অনুযায়ী সেসময়ের পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের পাশাপাশি ফিল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে মৌলিক ও নতুন তথ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে। যেমন: একজন রিপোর্টার একাত্তরে শরণার্থীশিবিরে অবস্থানরত মানুষের ওই সময়কার অবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে আগ্রহী। তাহলে তাকে শরণার্থীশিবিরে অবস্থানরত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেসময়ে শরণার্থীশিবিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে, তা বাছাই করা। সেই মোতাবেক তথ্য নেওয়া। শরণার্থীশিবিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলা।

যদি গণহত্যা, বধ্যভূমি নিয়ে কোনো রিপোর্ট করতে হয়; তাহলে একটি জেলার উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রামের কোন স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, বধ্যভূমি কোথায় রয়েছে তার প্রাথমিক ধারণা নিতে হবে সেসময়কার পত্রপত্রিকা, জেলার গেজেট এবং ওই জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে। এরপর সরেজমিনে গণহত্যার ঘটনাটি কবে ঘটেছে, গণহত্যা কারা ঘটিয়েছে, গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ, কতজনকে এখানে হত্যা করা হয়, এই গণহত্যার শিকার শহিদদের নাম-পরিচয় প্রভৃতি তুলে আনা। দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য অনেক সময় গণহত্যার সাক্ষীরা তা প্রকাশ করতে ভয় পান বা অনেক তথ্য চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একজন রিপোর্টারকে তথ্যদাতার ভয়ের কারণ বের করতে হবে। তথ্যদাতা কোন কোন তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছেন, তা ধরার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হলো স্মৃতির অবলেপন। এত বছর আগে সংঘটিত এসব ঘটনার কথা অনেকেরই মনে নেই। অনেকে স্বাধীনতাবিরোধীদের ভয়ে বলতে চান না। আবার কেউ কেউ নিজের জমিতে ঘটনাটি ঘটায় বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চান। তাই কোন কোন তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছেন, তা ধরার চেষ্টা করতে হবে। বধ্যভূমিবিষয়ক রিপোর্ট করতে হলে বধ্যভূমি কোথায় অবস্থিত, কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ পর্যন্ত এই বধ্যভূমিতে হত্যা সংঘটি হয়েছে, কতজনকে এখানে হত্যা করা হয়েছে, শহিদদের পরিচয় এবং কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় (পাকিস্তানি সেনা, আলবদর, রাজাকার) প্রভৃতি। বধ্যভূমির জায়গাটি প্রত্যক্ষ করা, প্রত্যক্ষদর্শী, মুক্তিযোদ্ধা, শহিদপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা। গণকবরবিষয়ক রিপোর্টের ক্ষেত্রে গণকবর কোথায় অবস্থিত, কখন গণকবর দেওয়া হয়, কতজনকে গণকবর দেওয়া হয়, তাদের পরিচয়, কাদের দ্বারা এটি সংঘটিত হয় (পাকিস্তানি সেনা, আলবদর, রাজাকার) প্রভৃতি। গণহত্যা, বধ্যভূমি স্পট থেকে যদি কেউ জীবিত বা আহত অবস্থায় ফিরে আসেন তার সঙ্গে কথা বলা। তার শরীরে যেমন আছে আঘাতের চিহ্ন, তেমনই মনের ভেতর আছে ক্ষত। এ কারণে তিনি ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি ভালো বলতে পারবেন এবং তা বেশি তথ্যবহুল হবে। একটি গণহত্যার ঘটনার তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে এই কারণে যে, কেউ তথ্য দিতে গিয়ে তা অতিরঞ্জিত করে ফেলেছেন কি না বা ভুল তথ্য দিয়েছেন কি না, তা ভাষ্যকারদের জবানিতে প্রকাশ হয়ে আসে। একজন রিপোর্টারকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রিপোর্ট কখনো একজন ব্যক্তির তথ্যের ভিত্তিতে লেখা যাবে না। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রিপোর্ট তৈরির জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি অনন্য জায়গা।

আরেকটি বিষয়ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে, তা হলো মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতা মানে শুধুই স্বাধীনতাভিত্তিক সাংবাদিকতা নয় বরং দীর্ঘ সময়ের কার্যক্রমকে অর্থবহভাবে গণমাধ্যমের সহায়তায় সবার সামনে তুলে ধরা। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতা আরও গতিশীল হবে। এই ক্ষেত্রটিতে গণমাধ্যমকর্মীরা নতুন নতুন দিক উন্মোচন করতে পারবেন।

একাত্তরে বিশ্বগণমাধ্যম

বিশ্বগণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সুবাদে একাত্তরে পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার খবর জানতে পেরেছিলেন। আর জানতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের সমাচার।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমে কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে দৈনিক দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রতিবেদক সায়মন ড্রিং। তিনি ৬ মার্চ ঢাকায় এসে পরের দিন ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রত্যক্ষ করেন। মূলত এই ভাষণের মাধ্যমেই পাকিস্তানের রাজনীতি ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলন-সংগ্রাম সম্পর্কে তার সরাসরি অভিজ্ঞতার শুরু। এরপর তিনি সখ্য গড়ে তোলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাকর্মী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে একের পর এক রিপোর্ট পাঠান টেলিগ্রাফ পত্রিকায়। একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী দ্বারা হোটেলে অবরুদ্ধ হন। পরদিন সকালেই অন্য সাংবাদিকদের বিমানবন্দরে নিয়ে উড়োজাহাজে তুলে দেওয়া হলেও তিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হোটেলেই লুকিয়ে ছিলেন। একাত্তরের ২৭ মার্চ সকালে কারফিউ উঠলে হোটেলের

কর্মচারীদের সহযোগিতায় ছোট্ট একটি মোটরভ্যানে করে ঘুরে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক ও পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়। ওইদিনই তাকে লন্ডন চলে যেতে হয়। ঢাকায় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো প্রথম দফার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষ চিত্র উঠে আসে তার প্রতিবেদনে। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ৩০ মার্চ সেটি প্রকাশ হয়।

একাত্তরের ২৫ মার্চের গণহত্যার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) আলোকচিত্রী মাইকেল লরেন্ট। এ সময় তিনি কর্মচারীদের সহযোগিতায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের রান্নাঘরে লুকিয়ে ছিলেন। ২৭ মার্চ সকালে দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ উঠলে তিনি বেরিয়ে পড়েন। দেখেন সড়ক, ছাত্রাবাস, বস্তি–সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ, লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। পাকিস্তানি সেনাদের চোখ এড়িয়ে মাইকেল লরেন্ট তার ছবিগুলো জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে পাঠান। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ 'The Times' পত্রিকায় 'At Dacca University the burning bodies of student still lay in their dormitory beds... A mass grave had been hastily covered' শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যার রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস করাচির মর্নিং নিউজের সাংবাদিক ও ব্রিটেনের সানডে টাইমস পত্রিকার পাকিস্তান সংবাদদাতা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আটজন সাংবাদিককে পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসে। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের ঢাকা, কুমিল্লা, যশোরসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়ে দেখায়। বোঝাতে চেষ্টা করে এখানকার পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক। কেবল অল্পসংখ্যক দুষ্কৃতকারী সীমান্তে কিছু সমস্যা তৈরি করছে। ওই আট সাংবাদিকের মধ্যে সাত সাংবাদিক পাকিস্তান সরকারের চাহিদা অনুসারে প্রতিবেদন করলেও বাদ সাধেন মাসকারেনহাস। করাচি ফিরে তিনি ১৮ মে লন্ডনে যান সানডে টাইমসের দপ্তরে। একাত্তরের ১৩ জুন সানডে টাইমসে প্রকাশিত দুই পৃষ্ঠাজুড়ে 'জেনোসাইড' শিরোনামের প্রতিবেদনে তিনি বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমানের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার কথা তুলে ধরেন। তাঁর এই রিপোর্ট পড়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সানডে টাইমসের সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্সকে বলেছিলেন, লেখাটি তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

একাত্তরে মার্ক টালি বিবিসির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সংবাদদাতা ছিলেন। রেডিয়োর মাধ্যমে সকাল-সন্ধ্যা তিনি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। তিনি একাত্তরের ২৫ মার্চের বর্বর হামলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঢাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও জুনের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বিদেশি সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তান সফরের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে বিবিসি তাঁকে আবার বাংলাদেশে পাঠায়। তিনি সীমান্তবর্তী বিভিন্ন শরণার্থীশিবির ও জেলাগুলো ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করেন। দিল্লি থেকে তিনি বাঙালির দুর্দশা ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির খবর পাঠান। আবার লন্ডনে বসেও তিনি যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করেন।

মার্কিন সাংবাদিক নিউইয়র্ক টাইমসের দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গ একাত্তরের ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকায় ছিলেন। একাত্তরের ২৮ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমসে শনবার্গের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে নিরীহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বর্বরতার বর্ণনা করেন। গণহত্যার খবর প্রচার করায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। এরপরও তিনি বারবার সীমান্ত এলাকায় ফিরে এসেছেন। কখনো ঢুকে গেছেন মুক্তাঞ্চলে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকসহ বহু প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

> স্বাধীনতার ৫০ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্ট তৈরি করতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়। এর কারণ, ঘটনাসংশ্লিষ্ট অনেক প্রত্যক্ষদর্শী, মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে নেই। তাদের মধ্যে অনেকের স্মৃতিভ্রম হয়েছে। অনেকে অসুস্থ। দলিলদস্তাবেজও নষ্ট হয়ে গেছে

একাত্তরের ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে গিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন করেন ভারতের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লেখক-কবিরাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কলম ধরেন। আর আকাশবাণীতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধের সংবাদ পর্যালোচনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে বিদেশি সাংবাদিকদের এই রিপোর্ট, পাশাপাশি নিজের সংগ্রহকৃত সহায়ক তথ্য যাচাই-বাছাই করে এই প্রজন্মের একজন রিপোর্টার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন।

লেখক: সহ-সম্পাদক, যুগান্তর

মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিকের সংবাদ দর্শন আমাদের চাই

পলাশ আহসান

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয়ের পরদিন ১৭ ডিসেম্বর কোনো পত্রিকা প্রকাশ হয়নি। হয়েছিল ১৮ ডিসেম্বর। বিজয়ের যত খবর ওইদিনই প্রকাশ হয়েছিল। কোন পত্রিকায় কী শিরোনাম ছাপা হয়েছিল, এই লেখা শুরুর আগে সেটা জেনে নেওয়া দরকার। কারণ, ওইদিন আমাদের সাংবাদিকতা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছিল, তা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ হয়েছিল।

দৈনিক পাকিস্তানের মাস্ট হেড থেকে পাকিস্তান ক্রসচিহ্ন দিয়ে কেটে তার ওপরে বাংলা লিখে দৈনিক বাংলা হিসাবে পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। এই এক ক্রসচিহ্নের মধ্যেই ছিল পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের সহজ বার্তা। দৈনিক বাংলার প্রধান শিরোনাম ছিল 'জয় বাংলার জয়'। আজাদের শিরোনাম ছিল 'বীরের রক্ত স্রোত আর মায়ের অশ্রুধারা বৃথা যায় নাই', 'বাংলাদেশ রাহুমুক্ত'। পূর্বদেশ তাদের মাস্ট হেড পত্রিকার মাঝ বরাবর নামিয়ে এনেছিল। ওপরে শিরোনাম দিয়েছিল 'হে বীর হে নির্ভয় তোমারই হলো জয়, জয় বাংলা বাংলার জয়'। দৈনিক ইত্তেফাক শিরোনাম ছেপেছিল 'সোনার বাংলায় মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড'।

এবার আসছি একটু পেছনের গল্পে। আমাদের তথা বাংলাদেশের পত্রিকা প্রকাশের কাছে। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের আগ পর্যন্ত পত্রিকার সংখ্যা ছিল ১০টি। এর বেশির ভাগই কাজ করছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। বলা বাহুল্য, তারা স্বাধীনতার পক্ষের রাজনীতি প্রচার করছিলেন। সংগ্রামের মতো আর যে দু-একটি পত্রিকা বিরোধী মত প্রচার করেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশ স্বাধীন না হওয়ার রাজনীতি প্রচার।

কাজেই আমরা বলতেই পারি, বিশ্ব সাংবাদিকতার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সাংবাদিকতার শুরুটাও ছিল নিখাদ রাজনৈতিক।

আমার ব্যক্তিগত মত একটু ভিন্ন। আমি বলতে চাই না সাংবাদিকতা চোখ বন্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। আসলে সাংবাদিকতা সাংবাদিকতার পক্ষেই হেঁটেছে। অর্থাৎ সত্যের পক্ষে থেকেছে। বাঙালির দীর্ঘ যে বঞ্চনা, তা কোনো বানানো ব্যাপার ছিল না। সেই সত্য মানুষের সামনে তুলে ধরেছে।

মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টির যে গল্প শুনি তাতে তো আমার মনে হয়, ভয়ে সেসময়ের সংবাদপত্র অনেক কিছু বলতে পারেনি। অনেক কিছু বলেছে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। ইতিহাস বলছে, সত্য চেপে রাখতে পত্রিকা অফিসে আগুন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেও সাংবাদিকরা সত্য বলার কাজটি করেছেন। দেশে-বিদেশে মানুষ জেনেছে পাকিস্তানিদের ধর্মের নামে মিথ্যাচারের কথা।

এই সত্য জানতেও মানুষকে সেদিন নিজেকে গোপন করতে হতো। পত্রিকা পড়েছে লুকিয়ে। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনত রেডিয়ো কানে চেপে। জোরে রেডিয়ো বাজালে বাড়ির পাশের আলবদর পাকিস্তানি ক্যাম্পে খবর দিয়েছে। তারা এসে বহু বাড়ির বেতারযন্ত্র নিয়ে গেছে অথবা অকেজো করে গেছে। তারা রেডিয়ো শোনা এবং শোনানোর অপরাধে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যাও করেছে অনেক জায়গায়।

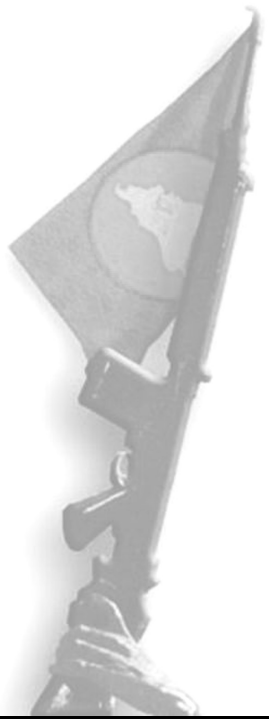

যাই হোক, দেশ স্বাধীনের পর বলতে আর কোনো দ্বিধা রইল না–বেশির ভাগ সাংবাদিকের সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল। আরও একবার সাংবাদিকের গর্ব মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। পরিষ্কার করে বলা হলো বেশির ভাগ গণমাধ্যম যেদিকে সত্য সেদিকে। এই সুযোগে বলে রাখি, আজও সেই সত্য বহাল আছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমকর্মীরা সবাই একসঙ্গে কোনো গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেননি।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, মুক্তিযুদ্ধের আগে যারা সাংবাদিকতা করতে এসেছেন, প্রত্যেকেই একটা শক্ত রাজনৈতিক ভিত্তি থেকে এসেছেন। তারা সবাই এমন মানুষ যে, ধমক দিলেই সত্য বলা বন্ধ করবেন না। তাই হাজার জোরেও তাদের জনতার বিপক্ষে দাঁড় করানো যায়নি। দীর্ঘদিন সেই পরম্পরা আমাদের সাংবাদিকতায় ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনভাবে কাজ করা সংবাদকর্মীদের অনেককে সুযোগ দেওয়ার পরও সাংবাদিকতা ছাড়লেন না। তবে বেশির ভাগই সরাসরি রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। অথচ তারা প্রায় সবাই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী। চাইলেই পারতেন নিরাপদ চকচকে জীবনযাপনে যেতে। কিন্তু বেছে নিলেন দিনের পর দিন বেতন না পাওয়ার পথ। হাজারটা অনিশ্চয়তার উচ্চৈঃস্বরের হাসিতে মাতিয়ে রাখলেন প্রতিটি বার্তাকক্ষ, সঙ্গে প্রেস ক্লাব।

এই সময়ে তাদের হাত ধরে সাংবাদিকতায় এলেন তাদেরই সমমনা কিছু ছেলেমেয়ে। তখনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা পড়ে সাংবাদিকতা করতে আসা শুরু হয়নি। এই জ্যেষ্ঠদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ করার পক্ষে জোর দিলেন। সহযোগীও হলেন কেউ কেউ। আবার বার্তাকক্ষেও সক্রিয় থাকলেন। তাদের হাত ধরেই এগোলো আমাদের সাংবাদিকতা। কোনো কোনো বিশ্লেষক এই সময় পর্যন্ত আমাদের সাংবাদিকতার রাজনৈতিক পর্ব বলে চিহ্নিত করেন। তারা এর সময় নির্ধারণ করেন ১৯৭১ থেকে ১৯৯০-৯২ পর্যন্ত।

বিশ্লেষকরা আজ পর্যন্ত সাংবাদিকতার সময়ে আরও দুটি ভাগ বসিয়েছেন। এর একটিকে বলেন শুধু নিরেট তথ্যনির্ভর সাংবাদিকতা। আরেকটি ভাগকে বলেন করপোরেট সাংবাদিকতা। বিশ্লেষণে বের হয়ে আসে রাজনৈতিক পর্যায় থেকে শুধু তথ্যনির্ভর সাংবাদিকতায় যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা হওয়ার কথা ছিল। এখানে গণমাধ্যম দিয়ে রাজনৈতিক দর্শন প্রচারের বিষয় ছিল না। মানুষের অধিকার-সচেতন করার বিষয় ছিল না। ছিল সমাজের নানা অসংগতি, অনিয়ম সামনে আনা জরুরি। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকরা সেই চর্চাতেই ছিলেন।

দুঃখজনক হচ্ছে, এরপর সাংবাদিকতার ধরন বদলে গেল। সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রগুলোর মালিকানা চলে গেল শিল্পগ্রুপের কাছে। যারা পত্রিকা ব্যবহার করলেন যার যার গ্রুপের স্বার্থে। সত্য প্রচারের দর্শন প্রবীণ সাংবাদিকরা ততদিনে ক্লান্ত হয়েছেন। কেউ মারা গেছেন। তারা যাদের পেশায় এনেছিলেন, তাদের কেউ কেউ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাতে শুরু করলেন। যিনি দর্শনে থাকতে চাইলেন, তিনি কোণঠাসা হয়ে গেলেন। আমাদের সাংবাদিকতার পরম্পরা নষ্ট হলো।

লেখার এ পর্বে পাঠক চলুন একটু পেছনে যাই। সেই ১২০০-১৩০০ শতকে আজকের ইউরোপের কোনো বন্দরে জাহাজ ভিড়ত। তখন তাদের কাছে একদল মানুষ আসতেন গল্প শুনতে। সেই গল্প তারা শুনে অন্যকে বলতেন। এভাবে পৃথিবীর এক প্রান্তের জরুরি তথ্য ছড়িয়ে পড়ত অন্য প্রান্তে। মানুষ মূলত এই গল্প থেকে সভ্যতা বিকাশের তথ্যটি ছেঁকে নিতেন। তারা বুঝতেন কোন গল্পটি তার লাগবে আর কোনটি লাগবে না।

অবশ্য আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাসে সেরকম কোনো কথক সাংবাদিকের খোঁজ পাওয়া যায় না। এখানে ১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ হয়। এরপর ইউরোপের সাংবাদিকতার সঙ্গে আমাদের সাংবাদিকতার মিল খোঁজার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৫৫৬ সালে ভেনিসের প্রথম মুদ্রিত পত্রিকা নিটিজি স্কিট থেকে শুরু করে ১৬২২-এর ইংল্যান্ডের কারেন্ট অব জেনারেল নিউজ পর্যন্ত প্রতিটি পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি। হিকির গেজেটের উদ্দেশ্যও ছিল মানুষের অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি।

সেই অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির পরম্পরা আমরা দেখেছিলাম স্বদেশি আন্দোলন থেকে বাংলা ভাষার আন্দোলন পর্যন্ত। অনেকে বলবেন, সেসময়কার উত্তাল রাজনীতির পক্ষ নিয়েছিল সংবাদপত্র। আমি বলব, ওইসময় সাংবাদিকরা ঠিকঠাক সাংবাদিকতা করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় নানা বাধার মুখেও সাংবাদিকতা চলেছে তার নিজস্ব গতিতে। যেটা কাজে লেগেছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ উৎখাত হয়েছে।

এরপর আরও যেসব ছোটোখাটো বদল দরকার হয়েছে সমাজে, তখনও সাংবাদিকতা সত্য তথা মানুষের পক্ষে ছিল। অন্তত ইতিহাস তাই বলছে। এই ধারাবাহিকতায় সাংবাদিকতা এসে পড়ে ভাষা আন্দোলনের কাছে। এখানে ভাষা আন্দোলনের কাছে গেল সাংবাদিকতা, না এই আন্দোলন সাংবাদিকতার জন্য সৃষ্টি হলো–এ নিয়ে গবেষণা হতে পারে। এই সন্দেহ মূলত তুলেছিলেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাদের আপত্তি ছিল তারা। তারা বলতেন, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে পত্রিকা অফিসে। এই বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাটা যে খুব কম, তা কিন্তু বলা যাবে না।

ইতিহাস গবেষণায় ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতাকারী যেসব বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আসে, তা শুনলে অনেকেই চমকে উঠবেন। এই লেখার উদ্দেশ্য অবশ্য কাউকে চমক দেওয়া নয়। আমি বরং বলি, ভাষা আন্দোলন সাংবাদিকদের সৃষ্টি। এই দাবির যুক্তিসংগত কারণ আছে। কারণ, রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার রাজনৈতিক দাবি যখন আইনসভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছিল, সেই বার্তা বহন করছিলেন বেশির ভাগ সাংবাদিক।

তাদের কেউ কেউ শুধু বার্তা বহন করে থেমে যাননি। রাষ্ট্রভাষার দাবি গণদাবিতে পরিণত করার কাজটিও সংঘটিত করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য তমদ্দুন মজলিস নামে যে সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফরম তৈরি হয়েছিল, এর মূল নেতৃত্বে ছিলেন সাংবাদিকরাই। প্রথম যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল, সেখানেও ঘোষণা দিয়ে সাংবাদিকদের প্রতিনিধি রাখা হয়েছিল। ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে আবার যখন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়, তখনও নেতৃত্বের সামনের সারিতে যারা ছিলেন, তাদের বেশির ভাগই তখন সাংবাদিকতায় যুক্ত। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষার মিছিলে গুলি এবং শহিদ হওয়ার খবর ঠিকঠাকভাবে ছাপতে না দেওয়ায় দু-একটি পত্রিকা থেকে নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের সাংবাদিকতার পরম্পরার কথা বলছিলাম। তাই এত কথা এলো। কিন্তু যে কথাটি বলতে এতকিছুর অবতারণা, সেটা হচ্ছে আমাদের সার্বিক সাংবাদিকতা নিয়ে ইদানীং খুব প্রশ্ন ওঠছে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বাড়ছে। সংবাদ প্রকাশের মাধ্যম বাড়ছে। কিন্তু যেটা আতঙ্কের, সেটা হচ্ছে–গণমাধ্যম মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এটা কার দোষ, কার গুণ, সেটা গবেষণার বিষয়। কিন্তু মোটা দাগে বলা যায়, একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণে পাঠক বা দর্শক বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কেন একই ঘটনার ভিন্ন বিবরণ? সহজ উত্তর–যে মাধ্যমের মালিক যেভাবে দেখতে চান, খবর সেভাবেই উৎপাদন হয়।

অবশ্য সব খবরের ক্ষেত্রেই যে এরকম হচ্ছে এমনটি নয়। কখনো কখনো হচ্ছে। ওই কখনো কখনোর খবরগুলো এক বালতি দুধে এক ফোঁটা লেবুর রস। আর মানুষের বিশ্বাস ভাঙলে তো জোড়া দেওয়া কঠিন। পেশার স্বার্থেই এখন আমাদের সেই কঠিন কাজটি করতে হবে। আমার কিন্তু মনে হয় না এটা খুব কঠিন কাজ। কারণ আমাদের সাংবাদিকতার দীর্ঘ সমৃদ্ধ পরম্পরা রয়েছে।

চাইলে সাংবাদিকরা ঠিকঠাক সাংবাদিকতাচর্চার দাবি তুলতেই পারেন। যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে, সেই দাবি এখন তোলাই উচিত। কিন্তু এর আগে আজকের সাংবাদিককে প্রস্তুত হতে হবে। সেই প্রস্তুতি শুরু হওয়া দরকার চিন্তা থেকে। তাহলে দরকার চিন্তাবিষয়ক বিজ্ঞান ঠিকঠাক দর্শনের। দর্শন তো সামনেই আছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলন। এ দুই সমৃদ্ধির কাছে গেলে তো দর্শন শুধু নয়, পরিষ্কার দিকনিদর্শন পাওয়া যাবে।

লেখক: যুগ্ম প্রধান বার্তা সম্পাদক, একাত্তর টেলিভিশন

মুক্তিযুদ্ধের সংবাদে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির উপায়

মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান

আধুনিক সময়ে গণমাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি সমাজ গড়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে গণমাধ্যম। সমাজের প্রতিদিনের বৈষয়িক প্রয়োজন থেকে শুরু করে তার মনস্তত্ত্ব ও আদর্শ নির্ধারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম, তা ইলেকট্রনিক মাধ্যম হোক বা প্রিন্ট মাধ্যম। মিডিয়ায় সংবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শকশ্রোতাদের বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়। তথ্য ও সংবাদের মাধ্যমে মানুষ নিজের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করে এবং প্রতিদিনের সংবাদ সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

সংবাদ শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ খবর বা নাবা। নাবা অর্থ সংবাদ ও ঘটনা। এই নামে পবিত্র কোরআনে একটি সুরা রয়েছে, সুরা নাবা। ৩০তম পারার প্রথম সুরা। অবশ্য সেখানে কেয়ামতের সংবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সংবাদকে নাবায়ে আজিম তথা মহাসংবাদ বা এক্সক্লুসিভ সংবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে (দ্র. সুরা নাবা, আয়াত: ২)। হাশরের ময়দানের চিত্র এবং পরকালের সপক্ষে প্রকৃতি ও নিসর্গ থেকে দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা নাবার পুরো অংশে। সংবাদ শিরোনামে কোরআনের একটি সুরা নাজিল হওয়া–ইসলামে সংবাদের গুরুত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। নাবা শব্দ থেকে নবি শব্দের উদ্ভব। এভাবে বিচার করলে নবি অর্থ সংবাদদাতা, যিনি তওহিদ, রিসালাত ও আখেরতের সংবাদ দেন।

বার্তা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ রিসালা। রিসালা থেকে রসুল শব্দের উদ্ভব, রসুল অর্থ বার্তাবাহক। নবি-রসুলরা মানবসভ্যতায় সবচেয়ে সম্মানিত। তাদেরকে নবি-রসুল নামকরণের মাধ্যমে সংবাদ ও বার্তার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মহান আল্লাহ। আখেরতের সংবাদ ও মহান আল্লাহর বার্তার মাধ্যমে তাঁরা মানুষের অভ্যন্তর গঠন করেছেন। তাঁদের চেতনা ও আদর্শ নির্মাণ করেছেন। নবি-রসুলরা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনে যেভাবে ভূমিকা রাখেন, সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীরা একটি জাতির বাহ্যিক ও বৈষয়িক উৎকর্ষসাধনে একইভাবে ভূমিকা রেখে চলেন।

নবি-রসুলদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না কোনো মানুষকে; কিন্তু তাঁদের নাম ও কাজের সঙ্গে যাদের নাম ও কর্মের মিল পাওয়া যায়, এটা নিঃসন্দেহে তাঁদের মর্যাদা প্রমাণ করে। আর এখান থেকে সাংবাদিকদের সম্মানের পাশাপাশি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্বশীলতার বিষয়টিও সামনে আসে। আসে সামগ্রিকতা ও সর্বজনীনতার দাবি। একজন সাংবাদিককে তার জাতি ও সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সামনে রেখেই কাজ করতে হয়। কোনো একটি অংশকে বাদ রেখে সাংবাদিক তার দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারেন না। একটা সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই সব পাঠকের কথা চিন্তা করতে হবে। কোন পাঠকের রুচি কেমন, তা বিচারবিশ্লেষণ করে তাকে সংবাদ উপস্থাপন করতে হবে। সমাজে বিভিন্ন রুচির মানুষ রয়েছেন। সাধারণ সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হয় অধিকাংশ দর্শক ও পাঠকের মন, মনন, রুচি ও চিন্তা।

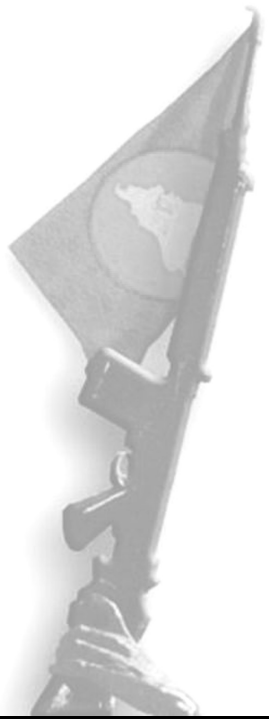

কিন্তু যাদের সাধারণভাবে কাছে টানা যায় না, তাদের জন্য সংবাদ উপস্থাপনের বিশেষ কায়দা রপ্ত করতে হয়। এভাবে একটা সংবাদমাধ্যম সর্বজনীন হয়ে ওঠে। এর উপকারিতা বিস্তৃত হয় পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রে।

একজন সংবাদকর্মী নিজে যে মনন ও বিশ্বাস লালন করেন, এর ছাপ অবশ্যই তার সংবাদে পড়ে। যতই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ হোক না কেন, উপস্থাপক বা লেখকের মানস কিছুটা হলেও প্রকাশ পেয়ে যায় তার উপস্থাপনায়। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমরা যাদের জন্য এবং যাদের উদ্দেশ্যে বলি বা লিখি, তাদের ভাষাটাও আমাদের রপ্ত করতে হবে। জানতে হবে তাদের সম্পর্কে। বিচিত্র মানুষের চিন্তাচেতনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে একজন সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীকে। তা না হলে মানুষের মনন পরিবর্তন করা যাবে না। যাকে যে ভাষায় কাছে টানা যায় এবং যাকে যেভাবে প্রভাবিত করা যায়, সেই কৌশল আয়ত্তে এনেই কাজ করতে হবে। মনে করুন, আপনি যদি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে কথা বলেন, তাকে মসজিদ নয়, মন্দিরের আদব সম্পর্কে বলতে হবে; এর বিপরীতে একজন মুসলিমের সঙ্গে মন্দিরের মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করে বেশিদূর এগোনো যাবে না। একজন গল্পলেখক কলকাতার বইমেলা সম্পর্কে জানেন; কিন্তু ঢাকার বইমেলায় কখনো আসেননি। তিনি যদি একুশের বইমেলা নিয়ে কোনো প্রতিবেদন তৈরি করেন, তার চোখে ঢাকা শহর নয়, কেবল কলকাতার মেলাই ভেসে ওঠবে। তার লেখায় বারবার কলকাতার মেলার বিবরণ চলে আসবে, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার পাঠককে ঢাকার বইমেলা বোঝাতে পারবেন না। এজন্য আপনি কোথায় বেড়ে উঠেছেন এবং কাদের মাঝে বেড়ে উঠেছেন, সেটা মুখ্য নয়–আপনি কাদের উদ্দেশ্যে বলছেন বা লিখছেন, সংবাদ উপস্থাপনে সেটিই মুখ্য হওয়া কাম্য। তা না হলে উদ্দিষ্ট বার্তা যথার্থভাবে যথাযথ মানুষের কাছে পৌঁছাবে না। হয়তো আপনি অনেক শ্রম দিয়ে একটি সংবাদ প্রস্তুত করেছেন; কিন্তু যাদের উদ্দেশে তা তৈরি করেছেন, সংবাদটি তাদের মনে কোনো দোলা দিতে সক্ষম হবে না।

এককথায়–আপনি আপনার কথাই বলবেন; কিন্তু ভাষাটি হতে হবে আপনার পাঠক বা শ্রোতার। রসুল (সা.) একজন বেদুইনের সঙ্গে তার গ্রামীণ ভাষায় কথা বলতেন (মুসনাদু আহমাদ ৫/৪৩৪, তাবারানি ১৯/১৭২, বাইহাকি ৪/২৪২)। প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগী ভাষায় কথা বলতে নির্দেশও দিয়েছেন হাদিসে। রসুল (সা.) বলেন, মানুষের সঙ্গে তাদের মন-মনন অনুসারে কথা বলো (বুখারি, মুসলিম, দায়লামি, আবুশশাইখ ইস্পাহানি। বুখারি ও মুসলিম শরিফে মাওকুফ বর্ণিত হলেও দাইলামি ও অন্যান্য গ্রন্থে সরাসরি রসুল (সা.) থেকেই বর্ণিত হয়েছে)।

একজন রিকশাচালক বা সাধারণ অশিক্ষিত শ্রমিকের সঙ্গে আপনি বিরাট দার্শনিক আলাপ জুড়ে দিলে বুঝতে হবে আপনার বাস্তববোধের বিরাট ঘাটতি রয়েছে। যে যেই ভাষা বোঝে, তাকে সেই ভাষায় বোঝাতে পারা একটি দারুণ দক্ষতা। এই দক্ষতা একজন সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীর এক বড়ো গুণ।

ভূমিকা দীর্ঘায়িত না করে মূল কথায় আসা যাক। আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের একটা ক্ষুদ্র অংশ কওমি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা। একসময় কওমি মাদ্রাসায় পত্রিকা পড়া হারাম ছিল, টিভি দেখার তো কল্পনাই করা যেত না। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে পুরোনো পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষত, এক দশক ধরে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতোই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা গণমাধ্যমের আওতায় এসেছেন। ওইসময় তাদের নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। এমনকি তাদের জন্য বিশেষ যেসব প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, সেগুলোও তাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, খুব কম সংবাদই মাদ্রাসাসংশ্লিষ্ট মানুষের মনে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। এর কারণ, গণমাধ্যমে তাদের ভাষায় এবং তাদের রুচি ও মনন অনুসারে প্রতিবেদন বা সংবাদ প্রচার করা হয় না। কেউ হয়তো বলবেন, মাদ্রাসাছাত্রদের প্রয়োজনে তারাই নিজেদের মনন বদলে গণমাধ্যম থেকে উপকৃত হোক, মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে এত গবেষণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই চিন্তাটি ঠিক নয়। কারণ একটি সমাজের প্রতিটি অংশ নিয়েই তার উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি। সমাজের একটি অংশ যদি অনেক এগিয়ে যায়, অন্য অংশ যদি থাকে আদিমযুগে পড়ে, তাহলে তা সেই সমাজের অসুখকেই চিহ্নিত করে। পুরো সমাজ একটি মানবদেহের মতো। কারও দুটি হাতের একটি হাত যদি অনেক মোটা হয়, অন্য হাতটি হয় চিকন, তাহলে মোটা হাতটির স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ঘটেছে বলা যাবে না, বরং এটি যে এক বিরাট অসুখ, তা যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। একই কথা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা গণমাধ্যম থেকে উপকৃত হবে, আর পিছিয়ে থাকবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা–এভাবে একটা সমাজের অগ্রগতি হতে পারে না। সবাইকে নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই কোনো দেশ উৎকর্ষসাধন করতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৪ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ লাখ। এর ভেতর ১ হাজার ২০৯টি মহিলা মাদ্রাসা। ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৬১৬ জন ছাত্রী। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে এই হিসাব। এই পরিসংখ্যানের বাইরে আরও বহু প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে। বিশেষত সম্প্রতি বহু মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এসব মাদ্রাসায় অসংখ্য ছাত্রী পড়াশোনা করছে। করোনার সময়ে বেশকিছু শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজ ছেড়ে মাদ্রাসায় পড়তে আগ্রহী হয়েছে। প্রতিবছরই নতুন নতুন মাদ্রাসা গড়ে ওঠছে। নতুন নতুন ছাত্রছাত্রী তাতে ভর্তি হচ্ছে।

আজ থেকে ২০ বছর আগেও অনেক মাদ্রাসায় বাংলা পড়া বা লেখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এখনো হয়তো কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে যেখানে বাংলার বদলে উর্দুতে ছাত্রদের পাঠদান করা হয়। কিন্তু সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে প্রায় সব মাদ্রাসায় বাংলা ভাষায় পাঠদান করা হয়। যেখানে উর্দু ভাষায় পড়ানো হয়, সেখানেও ছাত্রছাত্রীরা বাংলা সংবাদপত্র পড়ে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ দেখে বা শোনে। এককথায়–আগের মতো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যেসব প্রতিষ্ঠানে উর্দু ভাষায় পঠনপাঠন হয়, সেখানের ছাত্রছাত্রীরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় উর্দু নয়, মাতৃভাষা বাংলায় তাদের মনের অনুভূতি প্রকাশ করছে। ভাঙাচোরা যা পারে, তা লিখছে বাংলায়। ভালো ভালো লেখকও তৈরি হচ্ছে এসব মাদ্রাসা থেকে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ছড়া ও সৃজনশীল রচনার প্রতিটি শাখায় আজকাল কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের একাংশ বিচরণ করে যাচ্ছে। এ সময়টিকে কাজে লাগিয়ে এসব শিক্ষার্থীকে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একীভূত করতে হবে।

অন্যান্য সংবাদ বা প্রতিবেদন যাই হোক, সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এখনো মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের বলা হয়, দেশপ্রেম 'ইমানের অঙ্গ' কথাটি জাল হাদিস। হুব্বুল ওয়াতান মিনাল ইমান। অর্থাৎ, দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। এটি একটি উক্তি। ধর্মীয় স্কলারদেরই উক্তি। পাকিস্তান আমলে কেউ কেউ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে বলতে গিয়ে এটিকে নবিজির হাদিস হিসাবে প্রচার করত। এখন যারা এটা হাদিস নয় বলে প্রচার করেন,

তাদের উদ্দেশ্য মোটেও ভালো নয়। কারণ এটি হাদিস না হলেও কথাটি সত্য এবং এই কথার মর্মার্থ বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। পুরো ব্যাখ্যা না দিয়ে কেবল যখন এভাবে এটিকে জাল হাদিস বলে প্রচার করা হয়, তখন সাধারণ শিক্ষার্থীরা চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়। অথচ ইমাম সাখাভি (রহ.) (মৃত্যু: ৯০২ হি.) যখন তাঁর জাল হাদিস সংকলনগ্রন্থে এ হাদিস নিয়ে কথা বলেন, তখন বিস্তারিত বিচারবিশ্লেষণ করে লেখেন, 'হাদিসটির সনদ আমি খুঁজে পাইনি; কিন্তু এর ভাব বা মর্ম সম্পূর্ণ সঠিক (আলমাকাসিদুল হাসানহ পৃ. ২১৪)। তারপর বহু আয়াত ও হাদিস দ্বারা তিনি দেশপ্রেমের বিষয়টি প্রমাণিত করেন (দ্র. প্রাগুক্ত পৃ. ২১৪-২১৫)।

তরুণ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ আছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রতি খুব আগ্রহ আছে; কিন্তু তাদের উপযোগী করে তেমন কোনো কাজ তারা হাতের নাগালে পায় না। শিশুতোষ বই পড়ে তারা বুঝবে; কিন্তু তাদের বয়সটা তো আর শিশুর বয়স নয়, কাজেই তাদের উপযোগী বিভিন্ন সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী কাজ হওয়া জরুরি। বিশেষ করে গণমাধ্যমে কেবল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উপযোগী কিছু সংবাদ, উপসম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন তৈরি হলে এই বিরাট অংশকে সহজেই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা যায়। একটি উদাহরণ দেব। স্বাধীনতার ঘোষক কে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যখন একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আপনার লেখা পড়বে বা কোনো প্রতিবেদন দেখবে, তখন কেবল একথা বলা যথেষ্ট নয় যে মেজর জিয়া কেবল এই ঘোষণার পাঠক ছিলেন; স্বাধীনতার মূল ঘোষক স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। কেবল এতটুকু কথা বলা যথেষ্ট নয়। কারণ, একজন মেজরের পদমর্যাদা ও অবস্থান কী, এ সম্পর্কে এসব শিক্ষার্থীর কোনো ধারণা নেই। সে মনে করে, মেজর মানে বিরাট কিছু। একটি যুদ্ধগ্রস্ত দেশে সে-ই ডিসিশন দিতে পারে। মেজর জেনারেল ও মেজর যে এক নয়, তা তাদের বোঝাতে হবে। মেজরের পদ যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমনকি কর্নেলের চেয়েও নিচে, সেটিও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে। গণমাধ্যমকর্মীদের বুঝতে হবে এই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অবস্থা। দর্শক বা পাঠকের বাস্তব অবস্থা বুঝে তাকে বলতে হবে, একজন মেজর বা সেনা অফিসার কোনো দেশের সামগ্রিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না।

এটা একটা সামান্য উদাহরণ। তা না হলে এমন অনেক সহজ ও ক্ষুদ্র বিষয় সাধারণজ্ঞানের চর্চার অভাবে এবং অনেকটা সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে অনেক সময় বুঝতে পারে না। এটা তাদের দুর্বলতা; কিন্তু তাদের এই দুর্বলতা ধরতে না পারাও সাধারণ সমাজের বড়ো দুর্বলতা। রোগ ধরতে না পারলে ডাক্তার চিকিৎসা করবেন কীভাবে। একই কথা আলেমদের ক্ষেত্রেও বলা যায়। তারা তাদের কিতাবের ভাষায় কথা বলেন, যার ফলে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় বিষয়ে তাদের দেওয়া বয়ান অনেক সময় উলটা বা অর্ধেক বোঝেন। এক্ষেত্রে দুই পক্ষকেই অপর পক্ষের ভাষা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সব সময় সবকিছুকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন তাদেরকে ধর্মের ব্যাখ্যা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য যতই বোঝানো হোক, তারা বুঝতে চাইবে না। আপনি যদি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ না হলে আমাদের দেশের এত অর্থনৈতিক উন্নতি হতো না, তাহলে তারা বলবে, অর্থনীতির উন্নয়ন না হলেও ধর্ম নষ্ট হতো না। এখানে তাকে দেখাতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের আগে ঢাকায় মাত্র ৩০-৪০টি মাদ্রাসা ছিল। আর মুক্তিযুদ্ধের পর এখন ঢাকা শহরে চার হাজারের ওপর মাদ্রাসা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ না হলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য ইসলামি প্রকাশনা থেকে হাজার হাজার আরবি, উর্দু বইয়ের অনুবাদ ও মৌলিক ইসলামি বই বাংলা ভাষায় হতে পারত না।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের মুখোমুখি করা সম্ভব না হলেও পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে একটি মহল এই চেষ্টা করে গেছে। মাদ্রাসার কোমলমতি শিশুদের মনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের শেখানো হয়েছে–মুসলমানে মুসলমানে কোনো যুদ্ধ হতে পারে না। পাকিস্তানিরা আমাদের ভাই

মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামকে পাকিস্তানিরা মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিল। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এই চেষ্টায় তারা সফল হয়নি। প্রতিটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় আলেম বা হুজুরের পা ছুঁয়ে যুদ্ধে গেছেন। আলেমদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে যুদ্ধে গেছেন সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধারা। হিন্দু-মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই এটা কোনো কৃত্রিম বিষয় নয়। বরং এটা আমাদের দেশের বাস্তব ইতিহাস।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের মুখোমুখি করা সম্ভব না হলেও পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে একটি মহল এই চেষ্টা করে গেছে। মাদ্রাসার কোমলমতি শিশুদের মনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের শেখানো হয়েছে–মুসলমানে মুসলমানে কোনো যুদ্ধ হতে পারে না। পাকিস্তানিরা আমাদের ভাই। যুদ্ধ মানেই খারাপ কিছু। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবল হিন্দুদের দ্বারাই হতে পারে। ভারত যুদ্ধ করেছে, কোনো মুসলমান যুদ্ধ করেনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এভাবে মগজধোলাই করা হয়েছে যুগযুগ। অথচ ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। জঙ্গে

জামাল ও জঙ্গে সিফফিন নামে দুটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সাহাবিদের যুগেই। বড়ো বড়ো সাহাবি সেসব যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। সিফফিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হজরত আলি ও হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে কে ন্যায়ের পথে ছিলেন। ন্যায়ের পক্ষ নিতে হবে। অন্যায়ের পক্ষ ত্যাগ করতে হবে। সিফফিন যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইতিহাসবেত্তারা সর্বসম্মতিক্রমে হজরত আলি (রা.)-এর পক্ষ নিয়েছেন (তাবারি রচিত তারিখ, জাহাবি রচিত তারিখুল ইসলাম, ইবনু কাসির রচিত বিদায়া নিহায়া, ইবনুল আছির রচিত আলকামিল, ইবনু খালদুন রচিত তারিখ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ রচিত ইযালাতুল খাফা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

একাত্তর সালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অন্যায় করেছিল। তারা নিরীহ বাঙালিদের ওপর হামলে পড়েছিল। লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছিল। অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম নষ্ট করেছিল। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে কোনোভাবেই পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণের সুযোগ নেই। অবশ্যই বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ গ্রহণ করতে হবে একজন মুসলিমকে।

এখন পর্যন্ত কোনো একটি মাদ্রাসায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। পাঠ্যপুস্তকেও নেই, পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও ওস্তাদরা পড়তে উৎসাহিত করেন না। এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমে তাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান তৈরি করা আবশ্যক। সংবাদপত্রে যদি মাদ্রাসার ছাত্রদের আকৃষ্ট করার মতো কিছু উপাদান থাকে, তাতে তারা এভাবে ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারবে। এটা এমন বিষয় নয় যে একদিন কোনো ছাত্রকে বিরাট কোনো বয়ান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ গিলিয়ে দেওয়া যাবে। শৈশব বা কিশোর বয়সে পাঠ্যপুস্তকে এর উপাদান থাকলে সবচেয়ে সহজ হতো দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। সেই ব্যবস্থা যখন নেই, এর জন্য অপেক্ষা না করে গণমাধ্যমগুলো তাদের ভূমিকা রাখতে পারে। সীমিত পরিসরে হলেও বেশকিছু আলেম সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ প্রকাশ করা যেতে পারে। ভারতের যেসব আলেম সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে (পাকিস্তানের কিছু আলেমও বাঙালিদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইকে সমর্থন করেছেন। তাদের তথ্যগুলোও উপস্থাপন করা যেতে পারে)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিশোর ও তরুণ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে সরাসরি কথা বলতে পারেন গণমাধ্যমকর্মীরা। তাদের ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারেন। ইতিবাচকভাবে তাদের কথাগুলো উপস্থাপন করা যেতে পারে। একসময় একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর ও ২৬শে মার্চের মতো জাতীয় দিবস পালনকে মাদ্রাসায় শিরক-কুফর মনে করা হতো। সেই সময় নেই। এখন অধিকাংশ মাদ্রাসায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক কথাও বলা হয়, তবে সামগ্রিকভাবে ছাত্ররা স্বদেশের ভালোবাসা লালন করে। যদি সাংবাদিকরা মাদ্রাসায় যান, ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েক বছরেই অনেক সুফল দেখা যাবে।

নওলকিশোর মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করছেন এমন কিছু বুদ্ধিজীবী, যারা মাদ্রাসার প্রতি দরদ দেখান; কিন্তু মাদ্রাসার কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি জাতীয়তার বিষয়ে বিদ্বিষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেন। এর সূচনা সেই ইংরেজ আমল থেকেই হয়েছে। ইংরেজরা ১৮৭২ সালে যখন প্রথম আদমশুমারি করল, তখন তারা দেখতে পেল পুরো ভারতে পূর্ববাংলায় সবচেয়ে বেশি মুসলিম। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে তারা নানা তত্ত্ব বের করা শুরু করল। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের দূরত্ব তৈরি করতে গিয়ে ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীরা বললেন, এখানের মুসলিমরা মূলত বহিরাগত। তারা আরব, ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে এখানে এসে বসতি গড়েছে। হিন্দুরা স্থানীয়; কিন্তু মুসলিমরা বহিরাগত। এই মানসিকতার প্রচার এত বেশি হলো যে ১৯০১ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, নোয়াখালী জেলার শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ মনে করছেন তারা বহিরাগত। তাদের পূর্বপুরুষ আরব বা ইরানের। এভাবে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে বিতৃষ্ণ করা হয়েছে (দ্র. অসীম রায় রচিত ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ, পৃ. ৮২)।

আরও অনেক গবেষণা হয়েছে পূর্ববাংলার মুসলিম বসতি বিষয়ে। অথচ এত গবেষণার কিছু ছিল না। এদেশের মাটি ও মানুষের ভেতর কোমলতা রয়েছে। কোমল মনের মানুষই দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে। ইতিহাস তাই বলে। রসুল (সা.)-এর আদর্শ মক্কায় নয়, মদিনার মানুষ গ্রহণ করেছিল। মদিনার মানুষের মন ছিল নরম। একইভাবে হাদিসে ইয়েমেনবাসীর কথা বলা হয়েছে। ইমান ও হিকমতকে ইয়েমেনের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (বুখারি শরিফ: হাদিস নং ৪৩৯০)। কারণ ইয়েমেনবাসী খুব কোমল মনের ছিল। আরবসাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিতসাগরের কোলঘেঁষা সুন্দর একটি দেশ ইয়েমেন। তাদের পরিবেশই ছিল বাকি আরব থেকে ভিন্ন। শাহজালাল ও শাহ পরান ইয়েমেনি (রহ.)-সহ অসংখ্য সুফি তৎকালীন ইয়েমেন থেকে পূর্ববাংলায় ইসলাম প্রচারে এসেছেন। কোমল পরিচ্ছন্ন মন-মনন খুব সহজে ইসলাম ধারণ করতে পারে। পূর্ববাংলার মাটি-মানুষের বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করেছে। তা না হলে কি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী উত্তর ভারতে ছিলেন। বিহার, গুজরাট ও লাহোরে অনেক আগে ইসলাম এসেছে, সেখানে বাংলাদেশের চেয়ে বড়ো বড়ো পির, আওলিয়া অবস্থান করেছেন; কিন্তু সেখানে এভাবে বিশালসংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। এর অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব ধর্মাচার ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্য ধর্মাবলম্বীরাও মরমি সাধনার ভক্ত। ইসলামের প্রেমের আহ্বান এজন্য এদেশের সাধারণ মানুষের মনে দোলা দিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ কি ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল?

এমন একটা কথা রটানো হয়, ইসলামের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রায় বক্তৃতায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেন। এমনকি সাতই মার্চের ভাষণ শেষ করেন 'ইনশাআল্লাহ' দিয়ে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের স্বৈরশাসকরা ইসলামি আদর্শ থেকে বহুদূরে ছিল। মদ্যপ ছিল। নামাজ-কালামের কোনো খবর ছিল না। তাদের একটাই কাজ ছিল–বাংলার হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মানুষকে চিরদিন গোলাম বানিয়ে রাখা। হিন্দুদের প্রতি চরম বিদ্বেষ ছড়ানো হতো। অথচ ইসলামে একজন হিন্দুর গ্লাস থেকে পানি পানে বাধা দেওয়া হয়নি; কিন্তু একজন শরাবি মদ্যপ মুসলিমের মুখ লেগেছে যেই গ্লাসে, সেই গ্লাস থেকে পানি পান করতে নিষেধ করা হয়েছে (হিদায়া, কুদুরি, তুহফাতুল ফুকাহা, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি)।

এই নিবন্ধে যেই পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এর সারকথা নিম্নে দেওয়া হলো:

* মাদ্রাসাছাত্রদের পিছিয়ে রেখে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।
* তাদেরকে মূলধারায় যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।
* মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাদের উদ্দেশে কিছু সংবাদ ও উপসম্পাদকীয় ছাপতে হবে।

* সাক্ষাৎকার বা স্মৃতিচারণা প্রকাশ করতে হবে।
* এসব করতে হবে তাদের ভাষায়।
* যে কোনো সংবাদ বা প্রতিবেদনে অবশ্যই পূর্বাপর ব্যাখ্যা করে সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অনেক বিষয়ের সাধারণজ্ঞানটুকু এসব শিক্ষার্থীর নেই। সেভাবেই সংবাদ উপস্থাপন করতে হবে।
* মুক্তিযুদ্ধ কি ইসলামের বিরুদ্ধে হয়েছিল? এই প্রশ্ন উঠাতে হবে। এর উত্তর আলেম ও মুফতিদের মুখ থেকেই বের করতে হবে।
* মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ হতে পারে না বলে যে কথা রটানো হয়েছে, ইসলামের ইতিহাস থেকেই এর উত্তর দিতে হবে।
* জাতীয় দিবসগুলোয় বিভিন্ন মাদ্রাসায় গিয়ে সরাসরি তরুণ ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং সেই অভিজ্ঞতা সংবাদে প্রকাশ করতে হবে।
* ভারত বা পাকিস্তানের যেসব আলেম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের বিষয়টিও ফলাও করে প্রচার করতে হবে।
* কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং ধীরে ধীরে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করে যেতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে।
* কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে মাদ্রাসার ভেতরের সমস্যা এবং সমস্যা বুঝে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। মুখস্থ বয়ান কোনো কাজে আসবে না।

তথ্যসূত্র

কোরআনুল কারিম, তাফসিরে তাবারি, তাফসিরে কুরতুবি, তাফসিরে কাবির, তাফসিরে ইবনু কাসির, বুখারি শরিফ, মুসলিম শরিফ, তিরমিজি শরিফ, সুনানে দারাকুতনি, সুনানে বাইহাকি, তাবারানি শরিফ, মুসনাদু আহমাদ, মুসনাদুল ফিরদাউস, আবুশশাইখ ইস্পাহানি, আলমাকাসিদুল হাসানা, ইবনু খালদুনের ইতিহাস, তারিখে তাবারি, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, আলকামিল, যাহাবি রচিত তারিখুল ইসলাম, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রচিত ইযালাতুল খাফা, হিদায়া, কুদুরি, তুহফাতুল ফুকাহা, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি, অসীম রায় রচিত ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ।

লেখক: শিক্ষাবিদ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

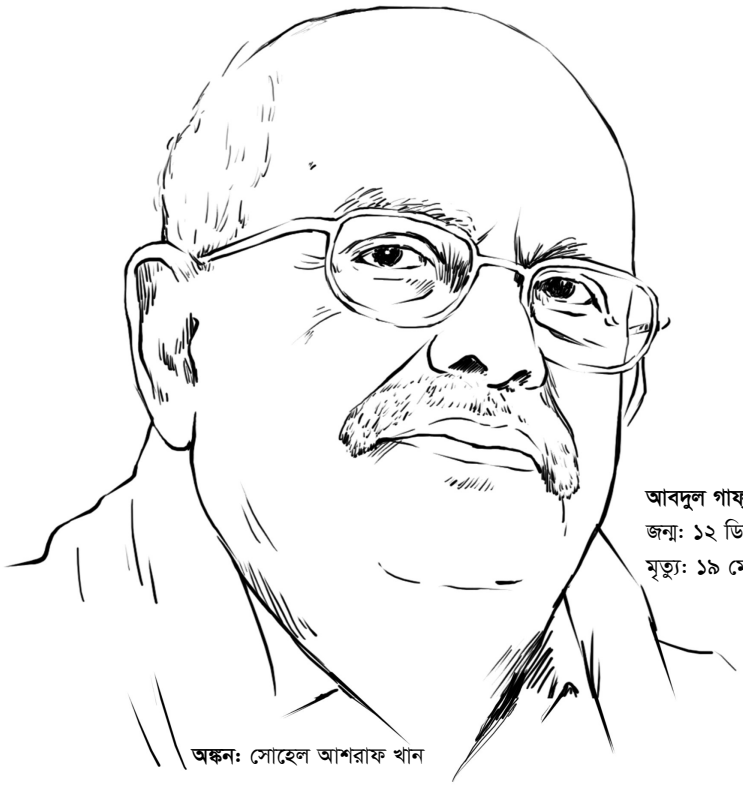

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
জন্ম: ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪
মৃত্যু: ১৯ মে ২০২২

অঙ্কন: সোহেল আশরাফ খান

যুগযুগান্তরের মহিরুহের উপাখ্যান

দুলাল আচার্য

বাঙালির সাংবাদিকতাজগতের নক্ষত্র আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। পাঠকসমাজে প্রগতিশীল কলামিস্ট হিসাবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি। ১৯ মে ৮৮ বছরে জীবনাবসান হয় এই প্রবীণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কলামিস্টের। ছিলেন বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অভিভাবক। বাঙালির জীবন্ত ইতিহাসের অংশ ছিলেন তিনি। তাঁর কলম চলেছে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় প্রেরণার শক্তি হিসাবে। কলম চলেছে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তাঁর লেখা ও গবেষণাকর্ম আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। লেখনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখেছেন। সহজ করে বললে–বাঙালির হৃদয় জয় করা মহামানব তিনি। রাজনীতিবিদ না হলেও রাজনীতির উপকরণই ছিল তাঁর লেখার উপজীব্য। তিনি আজীবন দেশ ও দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন। রাজনীতির দুঃসময়ে তাঁর কলম খুঁজেছে সমাজ-রাষ্ট্রের নানা অসংগতির সমাধানের পথ। সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম কার্যত বুলেটের মতো বিদ্ধ করত অপশক্তিকে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ছাত্র অবস্থায় 'দৈনিক ইনসান' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে যে জীবনের শুরু, তার সমাপ্তি ঘটল ২০২২ সালের ১৯ মে সুদূর লন্ডনের একটি হাসপাতালে। আর কোনোদিন তাঁর হাতে উঠবে না কলম–এটাই বাস্তবতা; কিন্তু জীবনভর যা লিখে গেছেন, তা এখন প্রজন্মের গবেষণার উপকরণ।

তিনি ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'-এর রচয়িতা। গানটি লিখেছেন তরুণ বয়সে। একজন শহিদের খুলি উড়ে যাওয়া রক্তাক্ত শরীর দেখে তিনি গানটি লিখেছেন। এই গানটি শুধু বাংলা ভাষা নয়, সব ভাষাভাষী মানুষের কাছে ব্যাপক পরিচিত। বাঙালির যত স্বপ্ন, ত্যাগের ইতিহাস রয়েছে এবং ইতিহাসে যত স্মারক রয়েছে, এ গানটি তার অন্যতম।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিজীবনের স্মৃতিচারণের পথরেখা দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের। শুরুটা শেখ রেহানা প্রকাশিত ও সম্পাদিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা অফিসে। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বিচিত্রা কার্যালয়ে তিনি এসেছিলেন নতুন ব্যবস্থাপনায় ম্যাগাজিনটি প্রকাশের পর। এরপর দীর্ঘ পরিচয় দৈনিক জনকণ্ঠে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সুবাদে। তাঁর সাংবাদিকতার উপাখ্যান যুগযুগান্তরের। গাফ্ফার চৌধুরীর মতো মহিরুহের সঙ্গে স্মৃতিচারণ গর্বের এবং অহংকারের। বিশেষ করে আমার মতো নগণ্যের। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে–সব স্মৃতি লেখার উপজীব্য হয়ে ওঠার সুযোগ হয় না। তারপরও কয়েকটি স্মৃতি এখানে তুলে ধরছি।

সময়টা ২০০৯ সাল। দৈনিক জনকণ্ঠে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। প্রতি বুধবার চতুরঙ্গ পাতায় গাফ্ফার ভাই নির্ধারিত কলাম লিখতেন। তখন সুদূর লন্ডন থেকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে ৪/৫ পাতার লেখাটি পাঠাতেন। তাই মঙ্গলবার লেখার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। দুপুর ২টার পর একবার রিং দিতে হতো। এরপর ৫-৬টায় লেখা পাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত। তখন জানিয়ে দিতেন কতক্ষণ পর লেখা পাঠাবেন। লেখা পাওয়ার পর তাঁকে জানাতে হতো পেয়েছি। লেখা বুঝতে অসুবিধা হলে কনফার্ম করে নিতে হতো। অনেক সময় দুবার ফ্যাক্স পাঠাতে হতো। আর এই দায়িত্বটা আমার ওপরই ছিল। এ প্রক্রিয়ার জন্য আমাকে বেশ কয়েকবার টেলিফোনে কথা বলতে হতো। আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে আলী হাবীব ভাই (বর্তমানে কালের কণ্ঠের সহকারী সম্পাদক) এই দায়িত্বটি পালন করতেন। আমার যোগদানের পরপরই আলী হাবীব ভাই কালের কণ্ঠে চলে যান।

প্রথম দিনের একটি স্মৃতি: গাফ্ফার ভাইয়ের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন তিনি মনে করেছেন আমিই আলী হাবীব। কথার শেষ পর্যায়ে আমার পরিচয় দিলে তিনি হেসেই বললেন, 'আরে তুমি তো আলী হাবীবের ক্লোন।' পরে শুনেছি আলী হাবীব ভাইকেও তিনি বিষয়টি বলেছিলেন। দৈনিক জনকণ্ঠ আর গাফ্ফার ভাই যেন একে অপরের পরিপূরক। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দুলাল, জনকণ্ঠে লিখে আমি তৃপ্তি পাই। আসলে আমার উপলব্ধিগুলো প্রকাশের যথাযোগ্য জায়গাই হলো জনকণ্ঠ।'

আরেকটি মজার বিষয় ছিল–পাঠকদের অনুরোধ। পাঠকের মন জয় করা লেখাগুলো প্রকাশ হলে প্রচুর টেলিফোন আসত। আবার অনেক সময় পাঠকের আগ্রহের বিষয়ে লেখার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতাম। বাংলাদেশের কোনো ঘটনা ঘটলে সেই বিষয়ে লেখার জন্য তথ্য-উপাত্ত জানতে চাইতেন। বলতেন, আমাকে পাঠাও। অবশ্য তথ্য পাঠানোর কাজটি আমার মতো অনেকেই করতেন।

২০১৩ সালের প্রথমদিকের ঘটনা। আমি দৈনিক জনকণ্ঠ ছেড়ে দৈনিক বর্তমানে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিই। উদ্‌বোধনী সংখ্যার জন্য উপদেষ্টা সম্পাদক রাহাত খান আমাকে বললেন, গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা দরকার। আমি বললাম ঠিক আছে। আমি যথারীতি গাফ্ফার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি প্রথমে রাজি হননি। পরে আমার আগ্রহের জয় হয়। তিনি দুই পৃষ্ঠার একটি লেখা আমাকে দেন। ছোটো অথচ অসাধারণ একটি লেখা। পত্রিকাটির শুভকামনা নিয়ে লেখাটি সবার মন জয় করে।

৬ মাস পর আমি আবার দৈনিক জনকণ্ঠে ফিরে আসি। গাফ্ফার ভাইকে বিষয়টি জানাই। তিনি বললেন, 'তুমি ফিরে আসবে আমি জানতাম। তোমাকে নিয়ে আসার জন্য আমি স্বদেশকে (স্বদেশ রায়, নির্বাহী সম্পাদক) বলেছিলাম। ভালই হলো। আসলে তোমার জায়গা এটাই।'

২০১৫ সালের ঘটনা। তখনও ফ্যাক্সে লেখা পাঠাতেন। একদিন বললাম, ভাই বাংলাদেশ তো ডিজিটাল এখন। সবাই চায় আপনিও তাই হোন। হেসে বললেন, তুমি কী চাও? বললেন, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। এখন থেকে আমি ই-মেইলে লেখা পাঠাব। লেখা স্ক্যান করে মেইলে পাঠাব। তোমার মেইল আইডিটা পাঠাও। বললাম, ভালোই হবে ভাই। এভাবে দুবছরের বেশি সময় তিনি ই-মেইলে লেখা পাঠাতেন। অবশ্য আমি দৈনিক জনকণ্ঠ ছাড়ার আগে দু-একবার কম্পোজ করা লেখাও পাঠিয়েছিলেন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পিআইবির গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষা'র বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করে। আমাদের পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ স্যার নির্দেশ দিলেন 'মুজিব মানেই মুক্তি' শিরোনামের সংখ্যায় গাফ্ফার ভাইয়ের একটি লেখা চাও। বহুদিন পর গাফ্ফার ভাইয়ের সঙ্গে আমার কথা, রিং দিতেই বললেন, তুমি আছো তো? আমি হাসতে হাসতেই বললাম, ভাই এখনো আছি। বললেন, তোমার সব খবর ভালো তো? জবাব দিলাম। লেখার বিষয়ে ডিজি (মহাপরিচালক) স্যারের আগ্রহের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'এ মুহূর্তে লেখা সম্ভব না। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ঠিক আছে তুমি আগামী সপ্তাহে রিং দিও।' পরের সপ্তাহে কথা বলার আগে আমার দুটি প্রস্তুতি ছিল। যদি লেখা না দেন, তাহলে তাঁর লেখা 'সাংবাদিক বঙ্গবন্ধু' পুনর্মুদ্রণের অনুমতি চাইব। ডিজি স্যারের সম্মতি নিয়ে কথা বললাম। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে ছাপাতে পার।' তিনি মজা করেই বললেন, 'বিল দিবা তো?' আমি বললাম হবে। বললেন, 'কত হবে?' অঙ্কটা বলার পর বললেন- 'বিলটা তোমার জন্য দিয়ে দিলাম।' পরে অবশ্য লেখাটি সৌজন্য হিসাবে প্রকাশ করি।

আরেকটি স্মৃতি না বললেই নয়, ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিনে দৈনিক জনকণ্ঠের উপসম্পাদকীয় পাতায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার একটি লেখা প্রকাশ হয়। পরের সপ্তাহে কথা বলার সময় তিনি বিষয়টি উল্লেখ করলেন। বললেন, 'ভালোই হয়েছে। আমি যখন মারা যাব, তখনও আমাকে নিয়ে লিখো?' নির্মম বাস্তবতা হলো–সেই কাজটি আজ করছি।

দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা অটুট থাকলেও নানা সময় আক্ষেপ ও কষ্ট তাঁকে বিদ্ধ করেছে। একবার আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের এক ত্যাগী নেতাকে (নাম উল্লেখ করলাম না) নিয়ে একটি কলাম লিখেছিলেন। লেখাটি পেস্টিং হওয়ার পরও রাতে ছাপাখানা থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। কারণ, ওই নেতাকে প্রথম আলোসহ সমমনা কয়েকটি পত্রিকা জননেতা থেকে সন্ত্রাসী গডফাদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। উল্লেখ্য, ওই নেতার প্রতি কতিপয় মিডিয়ার আক্রোশ ওই অঞ্চলকে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগশূন্য করতে সহায়তা করছিল। এ বিষয়টিই তাঁর লেখায় উঠে আসে। লেখাটি জনকণ্ঠে প্রকাশ না হওয়ায় তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বিষয়টি তোয়াব খান, স্বদেশ রায় এবং পিআইবির বর্তমান মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ স্যারও জানতেন। এরকম ছোটো ছোটো বহু স্মৃতি আজ আমার মানসপট ছেয়ে আছে। যেসব স্মৃতি আমার অনন্তকালের সঙ্গী।

সাত দশকেরও বেশি সময়ের সাংবাদিকতা জীবন তাঁর। লেখালেখির প্রতিচ্ছবি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মননশীলতা। যখনই কোনো অপশক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তখনই গাফ্ফার চৌধুরী কলম ধরেছেন। সেই কলমে জাগিয়ে তোলার আহ্বান ছিল। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ায় প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। জীবনের শেষ সময়েও সক্রিয়ভাবে লেখালেখি চালিয়ে গেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু আদর করে তাকে 'মুসিবত' বলে ডাকতেন। তিনি গর্ব করে বলতেন, 'আমার জীবনের পরম সুভাগ্য আমি মুজিব যুগে জন্মগ্রহণ করেছি।'

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর জীবন-ইতিহাস অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত প্রজন্মের জন্য। তিনি বরিশাল জেলার উলানিয়ার চৌধুরীবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হাজি ওয়াহিদ রেজা চৌধুরী ও মা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন।

১৯৪৬ সালে বাবার মৃত্যুর পর তাঁকে চলে আসতে হয় বরিশাল শহরে। ভর্তি হন আসমত আলী খান ইনস্টিটিউটে। আর্থিক অনটনের মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাজীবনও। তাই উপার্জনের পথ খুঁজতে হয়েছে অল্পবয়সেই। ১৯৪৭ সালে তিনি কংগ্রেস নেতা দুর্গামোহন সেন সম্পাদিত 'কংগ্রেস হিতৈষী' পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে সওগাত পত্রিকায় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর প্রথম গল্প ছাপা হয়। বরিশালের আরেক কৃতীসন্তান শামসুদ্দীন আবুল কালামের লেখা তখন কলকাতার মূলধারার পত্রিকাগুলোয় ছাপা হতো। ১৯৫৩ সালে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বিএ অনার্স পাশ করেন।

১৯৫০ সালে গাফ্ফার চৌধুরীর কর্মজীবন পরিপূর্ণভাবে শুরু হয়। অবশ্য সাংবাদিকতা জীবনের চড়াই-উতরাই তাঁর জীবনে চলমান অধ্যায়। একই সময় তিনি 'দৈনিক ইনসাফ' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের 'মাসিক সওগাত' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পান গাফ্ফার চৌধুরী। একই সময় তিনি 'মাসিক নকীব' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সেবছরই বছর তিনি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'দিলরুবা' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ১৯৫৬ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। সেই সাথে তিনি প্যারামাউন্ট প্রেসের সাহিত্য পত্রিকা 'মেঘনা'র সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ১৯৫৮ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার রাজনৈতিক পত্রিকা 'চাবুক'-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পান। কিন্তু আইয়ুবের সামরিক শাসন চালু হলে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি মওলানা আকরম খাঁর 'দৈনিক আজাদ'-এ সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। একই সময় তিনি মাসিক 'মোহাম্মদীর'ও স্বল্পকালীন সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি দৈনিক 'জেহাদ'-এ বার্তা সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে তিনি সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'র সম্পাদক হন। ১৯৬৪ সালে সাংবাদিকতা ছেড়ে ব্যবসায়ী বনে যান। তিনি 'অনুপম মুদ্রণ' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নেশা তার সাংবাদিকতা, তাই আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতায়। ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে 'দৈনিক আওয়াজ' বের করেন। সেটা বছর দুয়েক চলেছিল। ১৯৬৭ সালে আবার 'দৈনিক আজাদ'-এ ফিরে যান সহকারী সম্পাদক হিসাবে। ১৯৬৯ সালে পত্রিকাটির মালিকানা নিয়ে বিবাদ শুরু হলে তিনি আবার যোগ দেন দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া মারা গেলে তিনি আগস্টে হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভার গ্রুপের দৈনিক 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় যোগ দেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা বাঙালির গৌবরের এক অনন্য অধ্যায়। যুদ্ধ শুরু হলে সপরিবারে আগরতলা হয়ে কলকাতা পৌঁছান। সেখানে মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা'য় লেখালেখি করেন। এ সময় তিনি কলকাতায় 'দৈনিক আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় কলামিস্ট হিসাবে কাজ করেন। কলমকে হাতিয়ার করে মাঠপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জোগান। তাঁর লেখা বিশ্ববাসীর নজর যেমন কাড়ে, তেমনই মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙা করে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'দৈনিক জনপদ' বের করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলজিয়ার্সে ৭২ জাতি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যান ১৯৭৩ সালে। দেশে ফেরার পর স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে কলকাতা নিয়ে যান। সেখানে সুস্থ না হওয়ায় ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি জমান। এরপর থেকেই তাঁর প্রবাসজীবনের রূপরেখা। লন্ডন যাওয়ার পর প্রথমদিকে তিনি বিভিন্ন গ্রোসারি দোকানে কাজ করেন। এরপর ১৯৭৬ সালে তিনি 'বাংলার ডাক' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'সাপ্তাহিক জাগরণ' পত্রিকায়ও তিনি কিছুদিন কাজ করেছেন। ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সাতজন অংশীদার নিয়ে 'নতুন দিন' পত্রিকা বের করেন। এরপর ১৯৯০ সালে 'নতুন দেশ' এবং ১৯৯১ সালে 'পূর্বদেশ' বের করেন। বাংলাদেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনা ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে লেখা কলাম অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

সাংবাদিকতার বাইরে একজন সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি পরিচিত। 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', 'নাম না জানা ভোর', 'নীল যমুনা', 'শেষ রজনীর চাঁদ'সহ তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে আছে 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ', 'একজন তাহমিনা' ও 'রক্তাক্ত আগস্ট'। তাঁর ডকুড্রামা 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ' তুমুল আলোচিত। প্রবাসে বাস করলেও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবাণী দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকশ্রদ্ধা জানিয়েছেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সংগঠন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের পক্ষ থেকে প্রেস ক্লাবে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

দেশের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। তাঁর জন্ম অন্ধকারে আলো ছড়ানোর জন্য। প্রতিক্রিয়াশীলরা জানতেন যে কোনো অন্যায়ে গর্জে উঠতে পারে তাঁর কলম। তাঁর এই মহাপ্রয়াণ পরিণত বয়সে হলেও যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা পূরণ হওয়ার নয়। অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর মতো মানুষের প্রয়োজন যুগে যুগে। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে গাফ্ফার চৌধুরী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পরপারে ভালো থাকবেন গাফ্ফার ভাই।

লেখক: সহকারী সম্পাদক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

শেষ যাত্রায় পিআইবি'র শ্রদ্ধার্ঘ্য

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

তারিখ : ২৫ জুন ২০২২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সম্মানিত সভাপতি, আমার সহকর্মীবৃন্দ, সামরিক-অসামরিক সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনেরা, পদ্মাপারের অধিবাসী, দুই পারেরই অধিবাসী আমার ভাই-বোনেরা, এলাকাবাসী, সুধীমণ্ডলী–আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশের ইতিহাসে আজ এক সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্‌বোধন করব পদ্মা সেতু। আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সুধীবৃন্দ, দেশবাসী, বিদেশে আমাদের প্রবাসী বাঙালি ভাই-বোনেরা তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার ছোটো বোন রেহানা এবং আমাদের ছেলেমেয়ে সজীব ওয়াজেদ, সায়মা ওয়াজেদ, রেদওয়ান মুজিবসহ আমাদের নাতি, নাতনি সকলকে এই দেশবাসীর সাথে আমি তাদেরকেও আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও দোয়া জানাচ্ছি।

স্বাধীন বাংলাদেশ দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রাম, ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের এই বাংলাদেশ। যাঁর নেতৃত্বে আমরা এই বাংলাদেশ পেয়েছি, বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে স্বীকৃতি পেয়েছি, মর্যাদা পেয়েছি। আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমাদের চার জাতীয় নেতা, ৩০ লক্ষ শহিদ, দু-লক্ষ মা-বোনকে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম, যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে আমাদের বিজয় এনে দিয়েছিলেন।

অত্যন্ত বেদনার সাথে আমি স্মরণ করি '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার ছোটো তিন ভাই–মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, ১০ বছরের ছোট্ট ভাই রাসেল; কামাল, জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা ও পারভীন রোজী, আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের (মুক্তিযোদ্ধা), আমার ফুপা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, কৃষিমন্ত্রীসহ সেইদিন আমাদের পরিবারের সদস্যরা যারা শাহাদতবরণ করেছেন। ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে যাদের আমরা হারিয়েছি, আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জামিল ছুটে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করতে, পারেননি। ঘাতকের দল তাকেও হত্যা করে। পুলিশের এএসপি, (এসবি) সিদ্দিকুর রহমান ঘাতককে বাধা দিয়েছিল দোতলায় উঠতে, তাঁকে সেখানে হত্যা করে, আমি তাদেরকেও শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশের মানুষের প্রতি। যারা এই অন্যায়কে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, আর এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে যারা জীবন দিয়েছিল তাদেরকেও আমি আজকের দিনে স্মরণ করি।

আজকে পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে, এর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, যে উপদেষ্টা কমিটি আমরা করেছিলাম–প্রকৌশলী জামিলুর রেজা সাহেবসহ সেতু নির্মাণকালীন যারা মৃত্যুবরণ করেছে, আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই।

আপনারা সবাই জানেন যে, এই সেতু নির্মাণ করতে যখন আমরা যাই, তখন অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়, দুর্নীতির অপবাদ দিয়ে কীভাবে এক-একটি মানুষ এক-একটি পরিবারকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে, সেই যন্ত্রণা ভোগ করেছিল আমার ছোটো বোন শেখ রেহানা, আমার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, আমার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ, রেহানার ছেলে রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিকী, আমার উপদেষ্টা অর্থনীতিবিষয়ক, পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজে যাকে আমরা উপদেষ্টা হিসেবে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ড. মসিউর রহমান, যোগাযোগমন্ত্রী সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, সাবেক যোগাযোগ সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াসহ যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। তাদের অমানুষিক যন্ত্রণা, তাদের পরিবারসহ যে যন্ত্রণা ভোগ করেছে, আমি তাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাই।

শত প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও এই সেতু নির্মাণের সাথে যারা জড়িত ছিলেন সকল প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ পরামর্শক, ঠিকাদার, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, শ্রমিক, নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সশস্ত্রবাহিনী বিশেষ করে সেনাবাহিনী এবং পুলিশবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই দেশবাসীর প্রতি, যারা সেদিন আমাকে শক্তি জুগিয়েছিল, সাহস জুগিয়েছিল, পাশে দাঁড়িয়েছিল।

আমি ধন্যবাদ জানাই এই পদ্মা সেতুর দুই পারের মানুষ, যারা এখানে বসবাস করত, তারা নির্দ্বিধায় তাদের জমি হস্তান্তর করে। তাদেরকে ও তাদের পরিবারকে আমরা পুনর্বাসন করেছি; কিন্তু তারা যে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে তাদের ত্যাগ ও সহযোগিতা না হলে হয়তো এই সেতু নির্মাণ করা কঠিন হতো।

আমি জানি সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আজকে বাংলাদেশের মানুষ গর্বিত। সেই সঙ্গে আমিও আনন্দিত এবং গর্বিত, উদ্‌বেলিত। অনেক বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আমরা আজকে এই পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি। এই সেতু শুধু একটি সেতু নয়, এই সেতু দুপারে যে বন্ধন সৃষ্টি করছে তা নয়। এ সেতু শুধু ইট, সিমেন্ট, স্টিল, লোহা, কংক্রিটের একটা অবকাঠামো নয়, এ সেতু আমাদের অহংকার, এ সেতু আমাদের গর্ব, এ সেতু আমাদের সক্ষমতা, আমাদের মর্যাদার শক্তি। এই সেতু বাংলাদেশের জনগণের। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ, আমাদের সৃজনশীলতা, সাহসিকতা, সহনশীলতা এবং আমাদের প্রত্যয় যে, আমরা এই সেতু তৈরি করবই, সেই জেদ সেই প্রত্যয়। যদিও এই ষড়যন্ত্রের কারণে সেতুটা নির্মাণ করতে প্রায় দুই বছর বিলম্বিত হয়। কিন্তু আমরা কখনো হতোদ্যম হইনি, হতাশায় ভুগিনি, আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছি এবং শেষ পর্যন্ত সকল অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথে আমরা যাত্রা করতে সক্ষম হয়েছি। আজকে পদ্মার বুকে জ্বলে উঠেছে লাল, নীল, সবুজ, সোনালি আলোর ঝলকানি। ৪২টি স্তম্ভ, এই স্তম্ভ যেন স্পর্ধিত বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না', কেউ দাবায়ে রাখতে পারেনি, আমরা বিজয়ী হয়েছি। তারুণ্যের কবি সুকান্তের ভাষায় তাই বলতে চাই:

সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়ঃ
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার,
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

আমরা মাথা নোয়াইনি। আমরা কখনো মাথা নোয়াবো না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনো মাথা নোয়াননি। তিনি আমাদের মাথা নোয়াতে শেখাননি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। বাংলার মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, আমরা তাঁরই অনুসারী। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা পথ চলি, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বাংলাদেশ দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতা, বাংলাদেশ একটি প্রদেশ, শোষিত-বঞ্চিত মানুষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা সব সময় যাদের নিত্যসঙ্গী। সেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ২৩ বছর সংগ্রাম, ৯ মাসের যুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়েই এই বাংলাদেশের সৃষ্টি। তাঁর ডাকেই সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে বিজয় এনে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা জাপানে গিয়েছিলেন '৭৩ সালে। জাপান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন আমাদের যমুনা, পদ্মায় সেতু করে দেওয়ার, যমুন নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, জাপান সরকার ফিজিবিলিটি স্টাডি করে এবং সেই সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে অবৈধভাবে যে মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতায় আসে সে সেই সেতুর কাজ বন্ধ করে দেয়।

যাহোক, আমাদের সৌভাগ্য আমরা '৯৬ সালে প্রায় ২১ বছর পর '৭৫-এর পর যখন সরকার গঠন করি, তখন আমরা সেই যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করি এবং আমি '৯৮ সালের ২৩শে জুন সেই সেতুর উদ্‌বোধন করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ যে, সেটা আমরা করতে পেরেছিলাম এবং সেই সেতুতে রেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ লাইন সংযোজন করেই আমরা সেতুটা নির্মাণ করি।

'৯৭ সালে আমি জাপান সফরে যাই। জাপানের প্রাইম মিনিস্টারকে আমি বলেছিলাম যে, আমার বাবা সেতু চেয়েছিলেন। আপনারা যমুনা সেতু আমাদের করে দিয়েছিলেন। আজকে আমি রূপসা অর্থাৎ সেটা হচ্ছে আপনার খুলনা-বাগেরহাটের সাথে সংযোগ, ভৈরব নদীর উপর এবং পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে চাই। কিন্তু আমি জানি পদ্মা অত্যন্ত খরস্রোতা একটি নদী, কাজেই সেই নদীতে সেতু করা যথেষ্ট কঠিন। জাপান তার ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু করে এবং রূপসা সেতু আমাদের নির্মাণ করে দেয়। এই খরস্রোতা বিশাল, পদ্মা নদী যে ফিজিবিলিটি স্টাডি হয় ২০০১ সালে, সেই রিপোর্টটা আমাদের দেয় এবং তারই ভিত্তিতে আমরা প্রথম ৪ জুলাই মাওয়া প্রান্তে আমরা আমাদের পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি।

স্বনামধন্য ব্যক্তি তিনি একটি ব্যাংকের এমডি ছিলেন, যেহেতু তার বয়স এমডি পদে আইনগতভাবে থাকতে পারেন ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত, তিনি ৭০ বছর বয়স হয়ে গেছে তখনও এমডি পদে বহাল। বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে বলেছিল যে, আপনি তো এভাবে থাকতে পারেন না। কারণ, আইনও সংশোধন হয়নি এবং তাকে তখন ওই ব্যাংকের মানে উপদেষ্টা করার জন্য উপদেষ্টা মানে অ্যাডভাইজার ইমেরিটার্স হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি খ্যাপে যান সরকারের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বিরুদ্ধে, আমাদের অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে–সবার বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেন, সে মামলায়ও হেরে যান। এরপরে আমরা দেখলাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের অর্থ বন্ধ করে দিল দুর্নীতির অভিযোগ এনে। যখন আমি এটা চ্যালেঞ্জ দিলাম যে অভিযোগ আমাকে দেখাতে হবে কী?

যাহোক, আমরা থেমে যাইনি, কারণ পদ্মা সেতু বানানো নিয়ে কোনো দুর্নীতি, এটা আমরা করতে পারি না, করব না। কাজেই অনেক পানি ঘোলা, অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক কিছু মোকাবিলা করলাম এবং এর সাথে যুক্ত হলো আমাদের অনেক বাংলাদেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে অনেক জ্ঞানী, গুণী তাদেরও নানারকম মতামত এবং

> আমরা মাথা নোয়াইনি। আমরা কখনো মাথা নোয়াবো না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনো মাথা নোয়াননি। তিনি আমাদের মাথা নোয়াতে শেখাননি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। বাংলার মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা চেয়েছিলেন

২০০১-এ যদিও আমরা ক্ষমতায় আসতে পারিনি, ক্ষমতায় আসে বিএনপি-জামায়াত জোট–এই সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়ে জাপানকে আবার ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে বলে অর্থাৎ আবার সমীক্ষা করতে বলে মানিকগঞ্জের আরিচা থেকে দৌলতদিয়া পর্যন্ত। জাপান পুনরায় সেটা করে একই মত দেয় যে, এখানে দক্ষিণ অঞ্চলের সকল জেলার সঙ্গে সংযোগের জন্য এই বিশেষ করে মাওয়া থেকেই সেতুটা নির্মাণ হলে সব থেকে কার্যকর হবে। কাজেই তাদের এই মতামতের পর খুব স্বাভাবিকভাবে বিএনপি আর সে ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই নেয়নি, কাজও করেনি।

কাজেই আমরা ক্ষমতায় আসি আবার ২০০৯ সালে। নয় সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই সেই পদ্মা সেতু নির্মাণ করার। যে সমীক্ষা জাপান করে দিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে এই সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নিই। সরকার গঠন করার মাত্র ২২ দিনের মধ্যে আমরা এর নকশা তৈরি করার জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ দিই এবং অনেক আলোচনার পর যখন এ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ হচ্ছে, কীভাবে অর্থ সংগ্রহ হবে, তার উদ্যোগ চলছে, তখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও এগিয়ে আসে অন্যান্য সংস্থার সাথে। বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পে টাকা দিতে রাজি হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, একটা পর্যায়ে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা যে আমাদের দেশের কোনো এক এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি যে সত্যি বুঝি দুর্নীতি যেখানে কোনো টাকাপয়সাই ছাড় হয়নি। যাক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মামলা করল; কিন্তু কানাডা আদালত যখন রায় দিল যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যত অভিযোগ সব ভুয়া, মিথ্যা, কোনো দুর্নীতি এখানে হয়নি, তারপর অবশ্য তারা থেমে যায়।

যাহোক, আমি এটুকুই বলব যে, বাংলাদেশ আমাদের দেশ। এদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা, কল্যাণ করা–এটাকে আমরা দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি। কাজেই যতই অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করুক এবং সেই সাথে আমার, রেহানার, আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপরেও কম ধকল যায়নি। সে বিষয়ে এখন আর আজকের দিনে বলতে চাই না। কিন্তু আমি এটুকুই বলব যে, যখন সকল প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন থেকে সরে দাঁড়াল, আমি তখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েও ঘোষণা দিয়েছিলাম পদ্মা সেতু নিজের টাকায় করব, নিজস্ব অর্থায়নে করব।

এই ঘোষণার পর আমার দেশবাসী, সাধারণ মানুষ তাদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলাম। তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মানুষের শক্তিটা হচ্ছে বড়ো শক্তি। সেই শক্তি নিয়েই এই সেতু নির্মাণকাজ আমি শুরু করি। আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে উপদেষ্টা কমিটি করেছিলাম জামিলুর রেজা সাহেবের নেতৃত্বে,

তারাও পিছু হটেননি। তারাও বিশ্বাস রেখেছিলেন। সেই সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার যারা আমাদের এখানে কাজ করেছেন, তারা তখন এগিয়ে এসেছিলেন এবং তারাও বিশ্বাস করেছিলেন যে, হ্যাঁ, আমরা পারি। আমরা করতে পারব এবং আমরা তা করেছি।

অনেকের মতামত ছিল এই নিজস্ব অর্থায়নে আবার কীভাবে করব। ধারণা ছিল যে, বাংলাদেশ সারা জীবন পরনির্ভরশীল থাকবে, আর অন্যের দয়ায় চলতে হবে। জাতির পিতা আমাদের শিখিয়েছেন আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে। বাংলাদেশকে আমরা আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবেই গড়ে তুলতে চাই। আর সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি। সেইদিন তারা আমার পাশে শুধু দাঁড়াননি, অনেকে অর্থ পর্যন্ত দিয়েছিলেন যারা যতটুকু পেরেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমরা নিজেরা বাজেট থেকে করতে পারব। ওটাও তো জনগণেরই টাকা এবং আল্লাহর রহমতে আমরা সেটাই করেছি। আমি জানি না যারা তখন এই কথাগুলো বলেছিলেন যে, এটা হবে না, নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভব নয়, এটা একটা স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু এটা কখনোই বাস্তব হওয়া সম্ভব না ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যাহোক, আমার কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। কারও বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ নেই। তাদের হয়তো চিন্তার দৈন্য আছে। আত্মবিশ্বাসের দৈন্য আছে। সেটাই আমি মনে করি। কিন্তু আজকে থেকে আমি মনে করি, তাদেরও আত্মবিশ্বাস বাড়বে যে–না, বাংলাদেশ পারে। এখানে একটি কথা আপনাদের স্মরণ করাতে চাই। স্বাধীনতার পর বিদেশি এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন বাংলাদেশের তো কোনো সম্পদ নেই। আপনি কী দিয়ে এই দেশ গড়বেন? জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন–আমার মাটি আছে, মানুষ আছে। এই মাটি, মানুষ দিয়েই এই দেশ গড়ব।

আজকের পদ্মা সেতু। আজকের পদ্মা সেতু কিন্তু সেই মানুষের সহযোগিতায় করতে পেরেছি। আমাদের অর্থনীতি স্থবির হয়নি, সচল আছে। অনেক প্রকল্প আমরা নিয়েছি। কাজেই আলহামদুলিল্লাহ, পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ধসে পড়েনি। বরং বাংলাদেশের অর্থনীতি করোনা মোকাবিলা করেছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ মোকাবিলা করেও বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো গতিশীল। সমগ্র বিশ্বের কাছে আজ বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ, আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ, আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ। কারণ বাংলাদেশের জনগণই হচ্ছে আমার সাহসের ঠিকানা। তাই বাংলাদেশের জনগণকে আমি স্যালুট জানাই।

সুধীমণ্ডলী,

আপনারা জানেন, পদ্মা একটা সাধারণ নদী না। পদ্মা নদী, বিশ্বের সব থেকে খরস্রোতা নদী হচ্ছে অ্যামাজন। আর এই অ্যামাজনের পরেই হচ্ছে পদ্মা। আর এই স্রোতঃস্বিনী পদ্মা, যে পদ্মা আনপ্রেডিক্টেবল, অনমনীয়। এর গতি, স্রোত কখন, কীভাবে এটা খুবই ধারণা করা কষ্টকর। প্রযুক্তি এবং কারিগরি নানা বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ ছিল। কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই আমাদের প্রকৌশলী কর্মীরা সকলে মিলে এবং বিদেশি পরামর্শক সকলে মিলেই এই সেতু আমরা নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছি।

পদ্মা সেতু নির্মাণকাজের গুণগত মানে কোনো আপস করা হয়নি। এই সেতু নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে। পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে। পদ্মা সেতুর পাইল বা মাটির গভীরে বসানো ভিত্তি এখন পর্যন্ত বিশ্বের গভীরতম। সর্বোচ্চ ১২২ মিটার গভীর পর্যন্ত এই সেতুর পাইল বসানো হয়েছে, যা বিশ্বের আর কোনো সেতুতে করা সম্ভব হয়নি। ভূমিকম্প প্রতিরোধ বিবেচনায় ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এরকম আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সেতু নির্মাণ পদ্ধতি বিশ্বজুড়ে প্রকৌশলী, প্রকৌশলী বিদ্যার পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কারণ এটা একটা আশ্চর্য সৃষ্টি।

এটা অনেক মানুষের শেখার অনেক সুযোগ হয়েছে এবং আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিশাল এই কর্মযজ্ঞ থেকে বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরে আমাদের দেশের প্রকৌশলী এবং কর্মীরা তারা যে জ্ঞান লাভ করেছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও অনেক স্থাপনা তারা করতে পারবেন বা অন্যদেশেও সহযোগিতা করতে পারবেন, সেই সক্ষমতা আজ আমরা অর্জন করেছি। সেতু নির্মাণ যেমন, তেমনই আঁকাবাঁকা খরস্রোতা উদ্ধত পদ্মা নদীকে শাসনে রাখাটাও একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জও সফলভাবে মোকাবিলা করে দুই পাড়কে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সেতুর উভয়দিকে রয়েছে উন্নত ব্যবস্থাপনাসমৃদ্ধ এবং দৃষ্টিনন্দন সার্ভিস এরিয়া। মাওয়া এবং জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে, যা মূল সেতুকে জাতীয় সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এটা শুধু বাংলাদেশই না, আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই সেতু অবদান রাখবে। এই সেতুর যে আমাদের এটা নদীপথ। কাজেই এখানে যেহেতু এটা খরস্রোতা নদী, তাই এই সেতুর যে ৩৭টা স্প্যান তার নিচ থেকেই যেন আমাদের নৌ চলাচলটা অব্যাহত থাকে। আমরা সেইভাবে কিন্তু এই সেতুটা তৈরি করেছি। কারণ, আমি আগেই বলেছি যে, পদ্মানদী কখন তার স্রোত কোনদিক থেকে যাবে, কী হবে বা স্রোতের টান কত বেশি, এ সম্পর্কে আগাম বলা খুব কঠিন কাজ। যে কারণেই আমরা এই সেতুকে কোনোরকম ছোটো করতে চাইনি। এই সেতুটা যেমন দুই পাশ সংযুক্ত করেছে এবং এর যে ৪২টি স্প্যান, তার নিচ থেকে অর্থাৎ ৩৭টি স্প্যানের মধ্য দিয়েও যেন সব জায়গা থেকে নৌ চলাচল সমানভাবে চলতে পারে, সেই ব্যবস্থাটাও রাখা হয়েছে।

এই সেতু নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে পদ্মা নদীর উভয় পারের তিন জেলা–মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুরে প্রায় ৬ হাজার ৫০৯ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সকলকে আমরা পুনর্বাসন করেছি। জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা দিয়েছি। তাদের জন্য প্লট দেওয়া হয়েছে, বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক প্লট করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের জীবিকার ব্যবস্থাও আমরা করে দিয়েছি এবং এই প্রকল্প এলাকায় একটা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বনায়ন কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে, সেখানে বনায়ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। জীববৈচিত্র্যের ইতিহাস ও নমুনা সংরক্ষণের জন্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদ্ভিদকুল ও প্রাণিকুল সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ইতোমধ্যে আমরা পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সেই অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যাতে আমাদের পরিবেশ এবং প্রকৃতি যেন রক্ষা পায়, সেই লক্ষ্য নিয়ে।

বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিতে নির্মিত এই দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল পদ্মা সেতু। এই সেতুর স্টিল এবং কংক্রিট স্ট্রাকচারে বহুমুখী এই সেতুর উপরে ডেক যানবাহন চলবে। আর নিচ দিয়ে ট্রেন চলাচল করবে। কাজেই রেলসেতু এর সঙ্গে। সেতু চালু হওয়ার পর সড়ক এবং রেলপথ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষের উন্নতি হবে। ব্যাবসা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। তারা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে। এই খরস্রোতা পদ্মা পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে না। রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি

যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। কাজেই সেদিক থেকে আমাদের দেশের মানুষের যারা সব সময় অবহেলিত অর্থাৎ আমরা পদ্মার ওপারের মানুষ চিরদিনই অবহেলিতই ছিলাম। আর অবহেলিত থাকবে না। আবার তাদের সমানভাবে উন্নত হবে।

আমরা আশা করি, যদিও এটা হিসাবে বলা হয়েছে, ১.২৩ শতাংশ আমাদের জিডিপি বাড়বে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এটা আরও বেশি হবে। আর তাছাড়া প্রতিবছর এই অঞ্চলে যে দারিদ্র্য, সেই দারিদ্র্যের হারও হ্রাস পাবে। নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা গড়ে তুলব। হাইটেক পার্ক আমরা গড়ে তুলব। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। দেশে শিল্পায়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা এই সেতু রাখবে। ইতোমধ্যে সেই লক্ষ্য নিয়ে এই অঞ্চলে, দক্ষিণ অঞ্চলে বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শুরু করে আমরা যা যা প্রয়োজন, সেগুলো কিন্তু করেছি।

এ বছরের শেষ নাগাদ আমাদের কর্ণফুলি তলদেশে টানেল বঙ্গবন্ধু টানেল, সেটাও সম্পন্ন হবে। মেট্রোরেল, সেটার একটা অংশ সম্পন্ন হবে। আর ২০২৩ সালে প্রথমার্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেটারও উৎপাদন শুরু হবে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় এটাও ২০২৩ বা '২৪-এর মধ্যে শেষ হবে। তাছাড়া পায়রার, পায়রার যে বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেখানে ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। সেখানে আরও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কাজেই সার্বিক দিক থেকে আমাদের অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে। দেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে।

আমি আবারও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাকে বারবার সাহস দিয়েছেন। আমি বাবা, মা, ভাই–সব হারিয়ে এদেশের মানুষের ওপর ভরসা রেখেই '৭৫-এর পর যখন ৬ বছর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে থাকতে হয়েছিল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করেছিল বলেই আমি দেশে ফিরে এসেছিলাম, আসতে পেরেছিলাম। অনেক, তখনও অনেক বাধা ছিল। কিন্তু এসেছিলাম একটি লক্ষ্যই সামনে নিয়ে–এই বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ আমার বাবা স্বাধীন করে গেছেন, এ বাংলাদেশ এভাবে অবহেলিত থাকতে পারে না। এই বাংলাদেশকে আমাকে কিছু করতে হবে এবং এই যে সাহস আমি পেয়েছি, এদেশের বাংলাদেশের জনগণ যেমন সাহস দিয়েছে, আর সব সময় আমি এটা অনুভব করি যে, আমার মা, আমার বাবা সব সময় তাদের দোয়া আমার ওপরে রেখেছেন। তাদের আশীর্বাদের হাত আমার মাথায় আছে। তা নইলে আমার মতো একটা সাধারণ মানুষ, যে অতিসাধারণ বাঙালি মেয়ে, এত কাজ করতে আমি পারতাম না যদি আমার বাবা-মায়ের দোয়া, আশীর্বাদের হাত আমার ওপর না থাকত। আমি তাদের কথা আজকে স্মরণ করছি।

আমি আশা করি, এই সেতুর কাজ বন্ধ করতে যারা নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেছিলেন বা বাধা দিয়েছে, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। তাদের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে। দেশের মানুষের প্রতি তারা আরও দায়িত্ববান হবে।

আজকে বাংলাদেশ আমাদের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫৯৪ মার্কিন ডলার। আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। আমরা প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হয়েছি। আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আমরা ব্রডব্যান্ড পৌঁছে দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল বাংলাদেশের মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। আমরা সেইভাবেই এগিয়ে যাব। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি-২০৩০-এর মধ্যেই আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব। বাংলাদেশ ২০২১ আর ২০২০, ২০২০ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। ২০২১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি। আর এই সময় আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা, যেটা কার্যকর হবে ২০২৬ সালে।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। ২০৪১ সালের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, মর্যাদা পাবে। ২১০০ সালের, ২১০০ সালের ডেল্টা প্ল্যান এই বদ্বীপটাকে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সুন্দর জীবন দেবে, সেই পরিকল্পনা নিয়েও আমরা তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আসুন পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধনের এই ঐতিহাসিক দিনে যে যার অবস্থান থেকে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে আমরা শপথ গ্রহণ করি যে, এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলব। জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা গড়ে তুলব।

বাঙালি জাতি বীরের জাতি। বাঙালির ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে রঞ্জিত হয়েছে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনেক রক্তধারা। বারবার আঘাত এসেছে, বাঙালি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাঙালি আবার এই আঘাতের পরও সদর্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। 'যতবারই হত্যা করো, জন্মাবো আবার, দারুণ সূর্য হবো–লিখবো নতুন ইতিহাস!'

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

“বাঙালি জাতি বীরের জাতি। বাঙালির ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে রঞ্জিত হয়েছে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনেক রক্তধারা। বারবার আঘাত এসেছে, বাঙালি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাঙালি আবার এই আঘাতের পরও সদর্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে”

বিরূপতার বিপরীতে সপ্রতীপ পদ্মা সেতু

জাফর ওয়াজেদ

সাহসের বরাভয় কাঁধে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। কত বাধাবিপত্তি, শত প্রতিবন্ধকতা, কণ্টক বিছানো পথ–সব মাড়িয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন দৃঢ় মনোরথে, দীপ্ত প্রত্যয়ে। দূরদর্শিতার দীপালোকে প্রোজ্জ্বলিত করেছেন জাতির জীবনে স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ থেকে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। পিতার মতোই সাহস তাঁকে দিয়েছে প্রেরণা, উদ্বুদ্ধ করেছে অগ্রগতির দুয়ার খোলার পরিক্রমায়। দূরকে কেবল নিকট নয়, পরকেও কাছে টানার সেতু তিনি নির্মাণ করে দিয়েছেন। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন নদীতে বিভক্ত ভূখণ্ডকে। নদী বিভাজিত দেশকে একসূত্রে গ্রথিত করার মধ্য দিয়ে যুগ-যুগান্তের পথকে করেছেন সমুন্নত। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর মেধা ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে তিনি দেশকে তাঁর শাসনামলে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার পথে এগিয়ে নিচ্ছেন। বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিভাত হয়েছে, বাংলাদেশ সক্ষম দেশ। সক্ষমতার আলোকে বিশ্বে অনেক বিষয় আজ রোল মডেলে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। প্রশংসিত হচ্ছেন শেখ হাসিনা। নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে যত বাগাড়ম্বর করুক জ্ঞানীরা, বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। তারা এই সেতু নির্মাণ শুরু করা হলেও শেষ করা যাবে না বলে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিল। কিন্তু আজ পদ্মা সেতু এক বাস্তবতা। তামাম বিশ্ব আজ তাকিয়ে দেখছে বাংলাদেশের পদ্মা সেতুকে। এই সেতু কেবল

একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকাশ নয়–শেখ হাসিনা তথা বাংলাদেশ সরকারের সাহস ও সক্ষমতারও প্রতীক।

২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক কথিত 'দুর্নীতি প্রচেষ্টা'র অভিযোগ এনে অর্থায়ন বাতিল করলে এর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তাও দেখা দিয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলেও বিতর্ক তৈরি করেছিল। শেখ হাসিনা শেষতক ঘোষণা দেন যে, নিজস্ব অর্থায়নে সেতু হবে। হয়েছেও তাই। তিনি সেতুর স্বপ্ন দেখেছেন, দেখিয়েছেন, বাস্তবায়নও করেছেন।

স্বপ্নপূরণের নয়া যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। আত্মনির্ভরশীলতার দিকে বাংলাদেশের অভিযাত্রায় নতুন পালক যুক্ত হলো। অযাচিত সমালোচনা, প্রতিবন্ধকতা, বিরোধিতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খরস্রোতা পদ্মায় আজ দৃশ্যমান বাঙালির স্বপ্নের পদ্মা সেতু। এই স্বপ্ন দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মনির্ভরশীলতার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ২০২২ সালের ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। প্রমত্তা পদ্মার বুকে এই অসম্ভব স্বপ্ন সম্ভবে পরিণত করার স্বপ্নদ্রষ্টা ও কারিকর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, এটি দ্বিতল দীর্ঘাকৃতির সেতু। নিচে রেললাইন, উপরে যানবাহন, যা কেবলই একটি বহুমুখী সড়ক ও রেলসেতু নয়। বিশ্বের সেরা প্রকৌশলবিদ্যা আর প্রযুক্তিতে নির্মিত দ্বিস্তরের পদ্মা সেতু ইতোমধ্যেই হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের আইকন, বাঙালি জাতির অহংকার, মর্যাদা ও সক্ষমতার প্রতীক। বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে যেমন স্ট্যাচু অব লিবার্টি, যুক্তরাজ্যের বিগ বেন, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, ব্রাজিলের ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার; তেমনই পদ্মা সেতু বিশ্ববাসীর কাছে অপার বিস্ময়। এই সেতু উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে সড়কপথে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বর্ণিল যাত্রা শুরু হলো। পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। প্রমত্তা পদ্মা যেমন তীব্র খরস্রোতা, গভীর ও ভাঙনপ্রবণ, তেমনই এর স্বভাব হলো একূল ভেঙে ওকূল গড়া। বাংলা গানে, গদ্যে-পদ্যে পদ্মাকে পাওয়া যায় নানারূপে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তো পদ্মায় বোটে বসে কত কবিতা, কত গান লিখেছেন। নজরুলও লিখেছেন পদ্মার ঢেউ নিয়ে গান। সেই স্রোতঃস্বিনী পদ্মায় সেতু নির্মিত হওয়ার পর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর ভূখণ্ডের সংযোগ সাধন হলো। এই পদ্মা সেতু শুধু ইট, বালু, সিমেন্ট, রড, কংক্রিট, ইস্পাতের সুবিশাল স্থাপনাই নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোটি কোটি বাঙালির ভালোবাসা, শ্রম-ঘাম ও আবেগমথিত স্বপ্ন। বাঙালির স্বপ্নপূরণের একটি বিশ্বস্ত ও আস্থার সার্থক রূপায়ণের নাম, যা বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশকে নতুন যোগাযোগব্যবস্থার দিগন্তে। প্রাযুক্তিক বিস্ময় পদ্মা সেতু বাঙালির গর্ব। পদ্মা সেতু কোনো সাধারণ সেতু নয়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা আর উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে সারা পৃথিবীতে একটি অনন্য সৃষ্টি। বাংলাদেশের এক বিশাল বড়ো সাফল্য এই সেতু। শেখ হাসিনার সদিচ্ছা, একাগ্রতা এবং আর্থিক সবলতা পদ্মা সেতু নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ হাসিনার ঐকমত্যের সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণের বিষয়ে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু করে। এজন্য বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু প্রকল্পের প্রকৌশল পরামর্শক যুক্তরাজ্যের রেন্ডল পালমার ট্রিটরোল (আরপিটি) নেডকো এবং বাংলাদেশ কনসালট্যান্টস লিমিটেডকে (বিসিএল) প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য নিয়োগ করা হয়। সরকারের নিজস্ব সম্পদে এই জরিপ হয়। তাদের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শেখ হাসিনার অনুরোধে একমাত্র জাপান সরকার নিজস্ব সম্পদে পদ্মা সেতু নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য রাজি হয়। ২০০২ সালের এপ্রিল থেকে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা দেয়, পদ্মা নদীর ওপর আর যেখানেই সেতু নির্মিত হোক না কেন মাওয়ায় হবে না। খালেদা-নিজামী সরকারের এই ভাষ্যে দাতা সংস্থার পক্ষে জাইকা দারুণ রুষ্ট হয় এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করতে অপারগতা প্রকাশ করে এই কাজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি তা করা না হতো, তাহলে ২০০৬ সালেই দেশের মানুষের চোখে পড়ার মতো কিছু কাজ দেখা যেত। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ঔদাসীন্য ও একগুঁয়েমির কারণে এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির–এমনকি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে তাদের আগ্রহ না থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ পিছিয়ে যায় তিন বছর। যেহেতু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশের মানুষের যোগাযোগের উন্নয়নকল্পে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কাজ শুরু করেছিলেন, সেহেতু প্রতিহিংসা আর পরশ্রীকাতরতার বশবর্তী হয়ে গৃহীত প্রকল্পের কাজ স্থগিত রেখেছিল তারা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০০৭ সালে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি গ্রহণ) অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এরপর ১০ হাজার ১৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একনেকের সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু, ১২ দশমিক ১৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং ১৬ দশমিক ৩০ কিলোমিটার নদীশাসন কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে পদ্মা সেতু নির্মাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রাখা হয়। ২০০৯ সালের ছয় জানুয়ারি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম সভায় বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ১০ দিনের মাথায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চুক্তি হয়। ২০০৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কাজ শুরু হয়। একই সঙ্গে এই প্রকল্পে রেলপথ সংযুক্ত করা হয়।

প্রথম দফায় ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি সেতুর ব্যয় সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের অর্থ, ঋণ হিসাবে জোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় পাঁচটি সংস্থা–এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা), ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক ও আবুধাবী ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণেও এই উন্নয়ন সহযোগীরা যুক্ত ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাংককে যুক্ত করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাংক সেতু বাস্তবায়নে ১২০ কোটি মার্কিন ডলার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছিল ২০১১ সালে। এজন্য চুক্তিও সই হয় একই বছরের ২৮ এপ্রিল। তারা চীনা রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিআরসিসি) নামে একটি বিশেষ কোম্পানিকে প্রাক-যোগ্য বিবেচনা করার জন্য বারবার চাপ প্রয়োগ করে। বিশ্বব্যাংকের গাইডলাইন মেনে দরপত্র আহ্বান করা হলে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান যোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক এতে সম্মতি না দিয়ে তাদের নির্দেশিত কোম্পানিকে বিবেচনার জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বানের পরামর্শ দেয়। তাতে আবারও পাঁচটি প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হয়। একপক্ষীয় বিশ্বব্যাংক তাদের পছন্দের কোম্পানিকে কাজ দেওয়ার জন্য চতুর্থবারের মতো নির্দেশনা দেয়। সে অনুযায়ী ওই কোম্পানির দরপত্র মূল্যায়ন করে দেখা যায়, জাল তথ্য পরিবেশন করেছে। বিদেশি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনেও বলা হয়, কোম্পানিটি অসত্য তথ্য দাখিল করেছে।

মূল সেতুর দরপত্রের প্রক্রিয়ার সময় বিশ্বব্যাংক প্রথম আপত্তি তোলে অযাচিতভাবে। অযথাই একটি অভব্য বিতর্ক তৈরি করে কল্পিত

দুর্নীতির অভিযোগ এনে বাংলাদেশের একটি স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী এবং একশ্রেণির সুশীলসমাজ ও গণমাধ্যম ভিত্তিহীন প্রচার চালায়। সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ মন্ত্রী, আমলাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। অপবাদ রটানো হয়। একজন মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। কল্পিত অভিযোগে আরও একজন সচিবকে কারাজীবন কাটাতে হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত চালিয়েও অভিযোগের প্রমাণ না পেয়ে মামলা প্রত্যাহার করে। সুপারভিশন কনসালটেন্সি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়নের কথিত দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক কাজ বন্ধ করে দেয়। একই সঙ্গে পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে ঋণ প্রত্যাহার করে নেয়। বিভিন্ন কায়দায় সত্যকে আড়াল করে দুর্নীতির উপাখ্যান তৈরি করে। অবশ্য কানাডার আদালতে মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে। কোনো দুর্নীতি হয়নি বলে আদালত রায় দেন। অভিযোগের সপক্ষে কোনো প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারেনি। অন্য উন্নয়ন সহযোগীরা এ ঘটনায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। তাদের কারও কারও কাছে বিষয়টি বিশ্বব্যাংকের বাড়াবাড়ি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের এ ঘটনার নেপথ্যে ছিল ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব স্বার্থ হাসিল। তা কার্যকর না হওয়ায় তারই পরামর্শে অসত্য অভিযোগ আনা হয়েছিল দুর্নীতির। সরকারের বিপক্ষে জনমত তৈরি ও অপপ্রচার চালাতে থাকেন বলে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ছাপা হতে থাকে। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি সই হয় ২০১১ সালের ২৮ এপ্রিল। আর একই বছরের ৫ মে ড. ইউনূসকে এমডি পদ থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তাকে এই পদে বহাল রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতরাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ জানান। সরকার অবশ্য তাকে ব্যাংকের উপদেষ্টা পদে থাকার প্রস্তাব করলেও ইউনূস গোঁ ধরে থাকেন। তার সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তারাও বেশ গোস্‌সা করেন এবং পদ্মা সেতুবিরোধী অবস্থানে অনড় থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ জবানিতে জানা যায়, বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সংবাদপত্রের সম্পাদককে সঙ্গে নিয়ে ড. ইউনূস হিলারির কাছে সমানে ই-মেইল পাঠান আর পদ্মা সেতুর জন্য অর্থায়ন বন্ধ করতে অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধে হিলারি বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট জয়েলিককে পদ্মা সেতুর জন্য অর্থ প্রদান বন্ধ করতে বলেন। রবার্ট জয়েলিক বিশ্বব্যাংকের দায়িত্ব ছেড়ে যাওয়ার দুদিন আগে ঋণচুক্তি বাতিল করেন। ইউনূসের এই অবস্থানের পক্ষে কিছু তথ্য মেলে।

> স্বপ্নপূরণের নয়া যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। আত্মনির্ভরশীলতার দিকে বাংলাদেশের অভিযাত্রায় নতুন পালক যুক্ত হলো। অযাচিত সমালোচনা, প্রতিবন্ধকতা, বিরোধিতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খরস্রোতা পদ্মায় আজ দৃশ্যমান বাঙালির স্বপ্নের পদ্মা সেতু

গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদে সত্তরোর্ধ্ব ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে (যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন) বহাল রাখার জন্য বিধিবহির্ভূতভাবেই মর্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং তার স্ত্রী শেরি ব্লেয়ারও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে চাপ দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের বলে দিয়েছেন–আইন ও বিধি অনুযায়ী ষাট বছর বয়সের পর তিনি ওই পদে থাকতে পারেন না। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনেকেই শেখ হাসিনাকে ফোন করে বলেছিলেন, 'ইউনূসকে এমডি পদ থেকে সরালে পদ্মা সেতু হবে না। পদ্মা সেতুর অর্থ আটকে যাবে।' প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন, পদ্মা সেতুর সঙ্গে ইউনূসের সম্পর্ক কী!

ড. মুহাম্মদ ইউনূসই হচ্ছেন এই দেশবিরোধী পদক্ষেপের মূল চরিত্র। তার জন্যই বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে দুর্নীতিপরায়ণ হিসাবে তুলে ধরার মতো ঘৃণিত কাজটি করা হয়। ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনে ইউনূস সক্রিয় হয়েছিলেন। বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করলেও দল গড়া আর হয়ে ওঠেনি। তার বয়স ৭০ পার হলে গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদ থেকে সরে যাওয়ার প্রশ্নটি সামনে আসে। ২০১০ সালে তাকে এমডি পদ ছাড়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টে মামলা করলে রায় তার বিপক্ষে যায়। ২০১১ সালের মে মাসে এই পদ ছাড়তে হয়। এরপর তিনি বিদেশে

সুশাসনের জন্য চিৎকার করা সুজন-এর বদিউল আলম মজুমদারের ভাষ্যে পাই, "তথাকথিত 'ইউনূস ইস্যু', বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে বলে আমাদের আশঙ্কা। অনেকেই হয়তো অবগত নন যে, সারা পৃথিবীতে, বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বের সচেতন সমাজে অধ্যাপক ইউনূস 'রকস্টার'-এর মতোই জনপ্রিয়। তাই তার প্রতি সরকারের অন্যান্য ও আক্রমণাত্মক আচরণ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্লিনটন পরিবারকেই নয়, সারা বিশ্বের অনেককেই হতবাক করেছে।" (প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০১২)। ড. ইউনূসকে প্রোমোট করার কাজে নিয়োজিত দুটি দৈনিকের একটি দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম ইউনূসের জন্য গীত গাইতে গাইতে গলা ব্যথা হওয়ার পরও জজবা ছাড়েননি। নানা অসত্য তথ্য মোড়কে পুরিয়ে বাজারজাতও করেছেন। ২০১৩ সালের ২৯ জুন প্রথম আলোয় 'সরকারের সাড়ে চার বছর, অহংকার, খামখেয়াল ও প্রতিহিংসা' শিরোনামে সরকারকে নসিহত করেছেন। ইউনূসকে কেন্দ্র করে 'শিবের গীত' গাইতেও ভুলেননি। তিনি মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে লক্ষ্য করে লিখছেন–"যেমন আমরা বারবার লিখেছি, বিশ্বব্যাংকের ঋণ এবং পদ্মা সেতুর মাঝখানে বাধা হিসেবে কেবল একজন ব্যক্তিই দাঁড়িয়েছিলেন। অবশেষে শেখ হাসিনা ওই 'একক ব্যক্তির' পক্ষে অবস্থান নিলেন। মন্ত্রিসভার সদস্য ও জ্যেষ্ঠ নেতাদের

আপত্তি সত্ত্বেও এটি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ দম্ভেরই বহিঃপ্রকাশ।" আবার লিখছেন, 'অহংকারের কারণে পদ্মা সেতু হারিয়েছি।' এই তিনিই আবার উল্লেখ করেছেন, "বুক বাজানো আত্মতুষ্টি ও জনতার মধ্যে উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা হিসেবে 'নিজস্ব অর্থায়নে' পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা জাতীয় মর্যাদা নিয়ে ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।...জনগণের আবেগ নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রতারণা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।...গ্রামীণ অবকাঠামো, সড়ক, রেলপথ, জলপথ, টেলিযোগাযোগ, জ্বালানি ও শিল্পায়নের মতো বিভিন্ন সংকটপূর্ণ খাতে অর্থায়ন বন্ধ রেখে কেবল পদ্মা সেতু নির্মাণের কোনো যৌক্তিকতা আছে কি? জাতীয় মর্যাদার বিষয়টি বিবেচনা করলে নিজস্ব অর্থায়নের কল্পিত গৌরবের চেয়ে দেশের জন্য বহুগুণ বেশি অপমান, অমর্যাদা ও কুখ্যাতি নিয়ে এসেছে পদ্মা সেতুর ঋণ কেলেঙ্কারি। 'নিজস্ব অর্থায়নের' বিষয়টি একটি বাজে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। জনস্বার্থের প্রতি এই স্পষ্ট 'অবমাননার' জন্য এই সরকারকে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। কীসের জন্য তারা এমনটা করল, একজন ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য?" ড. ইউনূসকে পদে বহাল রাখাসহ গ্রামীণ ব্যাংক পুনর্গঠন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মাহফুজ আনাম লিখেছিলেন সরকারকে সতর্ক করে, '...আমরা কোনো একটি প্রমাণ রাখার জন্যও লিখছি যে জাতীয় স্বার্থবিরোধী এরকম একটি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অন্তত কিছু প্রতিবাদ ও সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছিল।'

মাহফুজ আনাম যখন এসব সাফাই গাওয়ার পাশাপাশি পরোক্ষ হুমকির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন, তখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে খবরের ভেতরের খবরটুকু। "পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধে ড. ইউনূস ষড়যন্ত্র করছেন' বলে বিভিন্ন মহলে ওঠা অভিযোগ জনগণের কর্ণকুহরে পৌঁছে। মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে বিশ্বব্যাংকের ঋণ বাতিলের জন্য প্রফেসর ইউনূস সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিলেন, একথা এখানো এদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী তথা অর্থনীতিবিদ, এনজিও বিশারদ, শিক্ষকও মানতে নারাজ। প্রফেসর ইউনূসকে বিধি লঙ্ঘন করে সত্তরোর্ধ্ব বয়সে এমডি পদে বসানোর অপতৎপরতা কার্যকর না হওয়ায় বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত রাখা হয়। তারই তৎপরতায় বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জয়েলিক নজিরবিহীন পদ্ধতিতে ঋণ বাতিল করেন বলে সমালোচনা হয়।

একই সময়ে বাংলাদেশের পদ্মা সেতুবিরোধী প্রচারণা, লেখালেখি অব্যাহত থাকে। দেশীয় অর্থায়নে সেতু নির্মাণে শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা চালু হয় কতিপয় মহল থেকে। দুর্নীতির ইস্যুতে সুবিধা করতে না পেরে তারা প্রথমে হতাশ হলেও পরে বিরোধিতায় একাট্টা হয়ে উঠেন। দুর্নীতির অভিযোগ যখন ওঠে, তখন দেশের সুশীলসমাজ দাবি তোলেন যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে সরকারকে দ্রুত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। দুর্নীতির বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প স্থগিত রাখা উচিত। বিদেশি অর্থ বাদ দিয়ে দেশি অর্থ দ্বারা সেতু করার চেষ্টা করা হলে স্থানীয় বাজারে বড়ো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব বাড়বে। একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে। দেশের উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ হবে না।" (১১ অক্টোবর, ২০১১ দৈনিক সংবাদ) অথচ বাস্তবে আজ দেখি এসবই অলীক কল্পনামাত্র। বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেছেন, 'পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংক যে প্রশ্ন তুলেছে, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে। আলাপ-আলোচনা করে যদি সমাধান করা না হয়, তাহলে আদৌ পদ্মা সেতু হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, এ সেতু করতে হলে আমাদের বেশি ব্যয় করতে হবে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে। এরপরও যদি দেশি অর্থ দ্বারা সেতু করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে স্থানীয় বাজারে বড়ো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে। তখন উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ হবে না। সাধারণ মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।' আকবর আলি খানের অদূরদর্শী চিন্তাধারার প্রতিফলন কোথাও বাস্তব হয়ে দেখা দেয়নি। তিনিসহ অনেকেই শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করে শক্তপোক্ত অবস্থান নিতে সচেষ্ট ছিলেন। শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন তখন আত্মনির্ভরশীলতার দিকে অভিযাত্রা শুরু করতে। নিজস্ব অর্থয়ানে সেতু নির্মাণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে চাওয়া ছিল শেখ হাসিনার যুগান্তকারী এক সাহসী ঘোষণা। এই ঘোষণা দেশে-বিদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও ড. আকবর আলি খানের মধ্যে কোনো আবেদন তৈরি করেনি। পদ্মা সেতুর বিষয়টির রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতের দিকটির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেননি। শেখ হাসিনার আত্মনির্ভরশীলতার দিকে অভিযাত্রার যে বৃহত্তর তাৎপর্য রয়েছে, তা তাদের সংকীর্ণ হিসাবনিকাশের নিচে আড়াল হয়ে গিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একজন আমলা, অর্থনীতি নিয়ে লেখালেখি করা ড. আকবর আলি খানকে আজ বুঝতে হবে পদ্মা সেতু নির্মাণ পরীক্ষায় বাঙালি জাতি উত্তীর্ণ হয়েছে। একই সঙ্গে জাতির মনে এই প্রত্যয়ও জন্মেছে যে, পদ্মা সেতুর চেয়েও বড়ো প্রকল্প নিয়ে জাতি এখন ভাবতে পারে, কাজ করতে পারে। পদ্মা সেতু মূলত বাঙালি জাতি তথা তার নেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছাশক্তির একটি জয়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির সাবেক প্রধান নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'দুর্নীতির কারণে পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সমস্যা সমাধান করা দরকার ছিল। বিকল্প উৎস থেকে অর্থ এনে এত বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।' হতবাক হওয়ার মতোই বৈকি। নীতিনির্ধারণ পর্যায়ের একজন তাত্ত্বিকের দূরদর্শিতার সীমা কত সীমিত, একপেশে এবং বিদ্বেষপূর্ণ হতে পারে, এ তারই নমুনা। এমনকি ড. ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার যদি আবারও ক্ষমতায় আসে, তবে এজন্য তাদের ভয়ংকর নতুন সমস্যায় পড়তে হবে। এর দায় তারা মেটাতে পারবে না। আর যদি ভিন্ন সরকার আসে, তবে তারা আগের অপচয় মেনে নিয়ে তাদের পদ্মা সেতু প্রকল্প বাতিল বা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সেক্ষেত্রে পুরো জাতি বঞ্চিত হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা গচ্চা যাবে।' ২০১৩ সালের পর নয় বছরের মাথায় পদ্মা সেতু চালু হওয়ার দৃশ্যটি নিশ্চয় ড. দেবপ্রিয় ঘরে বসে টিভিতে দেখেছেন। তার 'বাড়া ভাতে ছাই' না দিয়ে বলা যায়, সংকীর্ণতায় আবিষ্ট থাকলে গচ্চার কথা চোখে ভাসে। আর ওনার মুখে ফুলচন্দন দিয়ে বলা যায়, আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় এলেও সেতু নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। আর দুর্নীতির যে রূপকথা ড. ইউনূসের কল্যাণে বিশ্বব্যাংক বাজারজাত করে আদালতের যে রায় পেয়েছিল, তাতে দুর্নীতির লেশ গন্ধ নেই।

পদ্মা সেতু নির্মাণে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন প্রয়াত জামিলুর রেজা চৌধুরী। তিনি বলেছিলেন, 'এই সেতু নির্মাণে সন্তুষ্ট যে কোনো প্রকৌশলীর জন্য একটা দুঃস্বপ্ন; একটা অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ এর সঙ্গে পুরো জাতির আত্মসম্মান জড়িত।' অথচ ড. আকবর আলি ও ড. দেবপ্রিয়র মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হলো না অর্থনীতির চৌহদ্দি ও গলিঘুঁজির মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করেও।

ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বলেছিলেন, 'পদ্মা সেতু নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করে ফেলা উচিত ছিল। দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।' অপরদিকে আইনবিদ ড. শাহদীন মালিক বলেছিলেন, 'পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হয়নি, তা সরকার মুখে বললে হবে না, প্রমাণ করে দেখাতে হবে। তবে এখন

এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ সরকারের আমলে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।' ড. ইউনূসের কারণে যে বিশ্বব্যাংক চুক্তি বাতিল করেছে, তা এড়িয়ে গিয়ে ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরুর রহমান বলেছিলেন, 'অযোগ্য মন্ত্রী ও আমলাদের কারণে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ঋণ সহায়তা স্থগিত করেছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়।'

বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের পর ২০১২ সালের ১০ জুলাই জেলা প্রশাসক সম্মেলনে বক্তব্যকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'পদ্মা সেতু নির্মাণে তার সরকার আর কোনো দেশ বা সংস্থার কাছে স্বেচ্ছায় সহায়তা চাইবে না। কেউ স্বেচ্ছায় দিতে চাইলে ভালো।' এরপরই দেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ এগোতে থাকে। ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে পদ্মা বহুমুখী প্রকল্পের মূল সেতুর নির্মাণকাজ উদ্‌বোধন করেন। তিনি এ প্রকল্পটিকে দেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করেন।

পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নেওয়া হয়েছে বলে ২০১২ সালের ৭ জুলাই বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় 'জাতিরাষ্ট্রের উন্নয়ন ভাগ্য নিয়ে তামাশা' শিরোনামে কলম লিখেছিলেন বিএনপি-জামায়াত ঘরানার সাংবাদিক সাদেক খান। অথচ তার জানা ছিল পাকিস্তান পর্ব থেকেই যে, জাতির ও রাষ্ট্রের ভাগ্যোন্নয়ন নিয়ে আওয়ামী লীগ দল এবং সরকার কখনো তামাশা করেনি। তিনিও ইংরেজি পত্রিকায় দুহাত উজাড় করে পদ্মা সেতুবিরোধী লেখা লিখে গেছেন মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত।

অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত। ২০১২ সালের ১৩ জুলাই জামায়াতিদের মুখপত্র সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় তিনি 'পদ্মা সেতু: নতুন সরকারের অপেক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, 'মনে হচ্ছে, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে হলে এ সরকারের মেয়াদকালে আর সম্ভব হবে না।' বাস্তবতাবিবর্জিত এসব অর্বাচীন ভাষ্য স্পষ্ট করে–অর্থনীতিবিদের তকমা পরিধান করলেও বিশ্লেষণী ক্ষমতা পুরোনো আমলেরই রয়ে গেছে। বিশ্বের যে অগ্রগতি হয়েছে, বাংলাদেশ যে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং আত্মনির্ভরশীলতার দিকে অভিযাত্রা, তা উপলব্ধি করার বোধটুকুও বোধহয় তিরোহিত হয়েছে। বিবিসির বিতর্কিত সাংবাদিকও বিদ্বেষ ছড়াতে ও জাতিকে নিরুৎসাহিত করতে অনেক বাগাড়ম্বর করেছেন। বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় ২০১২ সালের ১২ জুলাই 'স্বপ্নের কুসুম দিয়ে মহাকাশ সেতু তৈরি করবেন প্রধানমন্ত্রী' শীর্ষক লেখায় বলেছেন, '...নিজস্ব সম্পদ থেকে পদ্মা সেতু তৈরির কথাবার্তা আকাশকুসুম কল্পনামাত্র।' এই জ্ঞান নিয়ে বিবিসির মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন পাঁচ দশকের বেশি, ভাবতে অবাক লাগে! শেখ হাসিনার প্রতি তার বিদ্বেষের মাত্রা কত হীন পর্যায়ের ভাবা দুষ্কর। বেঁচে থাকলে তিনি দেখে যেতেন, নিজস্ব অর্থায়নেই বাস্তবায়িত হয়েছে পদ্মা সেতু। উদ্‌বোধনের দিনের অনুষ্ঠানের ধারাবর্ণনাও দিতে পারতেন। জনগণের সহযোগিতায় শেখ হাসিনার সরকারই আকাশকুসুমকে ধরার বুকে ঠাঁই দিয়েছেন মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপনের পথ ধরে। বিদ্বেষের কটাক্ষ ভরা পথ তৈরি করেননি। পদ্মা সেতুর নামে বরাদ্দ হওয়া বিশ্বব্যাংকের সেই টাকা উদ্ধার করে বাংলাদেশে অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করা হয় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতু উদ্‌বোধনের আগে। বলেছেন, যে অর্থ বাংলাদেশের নামে বরাদ্দ হবে, সেই অর্থ নষ্ট করার কোনো অধিকার তাদের নেই। অর্থাৎ পদ্মা সেতুতে তারা অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ করেছে। তবে বাংলাদেশ টাকাটা উদ্ধার করতে পেরেছে। অন্যান্য প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা যে করা যায়, অনেকেই তা জানে না। সত্যি তো, ব্যাংকিং এবং ঋণব্যবস্থা নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের ভাষ্য বিশ্লেষণ করলে হতাশাই জাগে। জ্ঞানের পরিধির বহর দেখে আশাবাদী হয়ে ওঠা যায় না। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমাদের যারা অর্থনীতিবিদ, আমাদের যারা কাজ করে, তারা এটা কেন মাথায় রাখেন না যে, তারা কোনো দাতা নয়। আমরা তাদের কাছে থেকে ভিক্ষা নিই না। ব্যাংকের একটা অংশীদার হিসাবে আমরা ঋণ নিই এবং সুদসহ সেই ঋণ পরিশোধ করি। তারা দাতা নয়, তারা উন্নয়ন সহযোগী। আমরা ঋণ নিই এবং শোধ করি। সুবিধা এই যে, সুদের হার কম।' বদরুদ্দীন উমরও একহাত নিতে ছাড়েননি। বর্ধমানে জন্ম মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাসিমের পুত্র বদরুদ্দীন উমরও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। যথারীতি বিষোদ্‌গার বহাল রেখেই লিখেছেন তিনি, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণে কোনো ব্যাপারই নয় বলে প্রধানমন্ত্রী যে আস্ফালন করেছিলেন, সেটা যে কত হাস্যকর এবং অবাস্তব ছিল, এ নিয়ে এখন আর কারও দ্বিমত থাকার উপায় নেই।' (সূত্র: 'সব শর্ত পূরণের পর বিশ্বব্যাংক ফিরে এলো', দৈনিক যুগান্তর, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২)। বদরুদ্দীন উমরকে নিয়ে যত কম কথা বলা যায়, ততই মঙ্গল। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা-বিদ্বেষে পূর্ণ তার লেখাজোখা। প্রতিহিংসাপরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতায় আবিষ্ট থেকে তিনি যা বলেন, তা ভেবেচিন্তে বলেন, এমনটা নয়। নিশ্চয় তিনি পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পিতৃপুরুষের ভিটেয় খুব কম সময়ে যেতে পারবেন। দেখবেন সব সমালোচনা উপেক্ষা করে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু। অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষক ড. আহসান এইচ মনসুর জামায়াতের মুখপত্র সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় 'পদ্মা সেতু: নতুন সরকারের অপেক্ষা' শীর্ষক ভাষ্যে উল্লেখ করেছিলেন, 'শুরু করতে পারলেও শেষ করার কোনো গ্যারান্টি থাকবে না।' এই হচ্ছে দূরদর্শিতা! বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কে এই হচ্ছে তাদের জ্ঞানের দৌড়! অথচ এরা নিয়মিতভাবে এদেশের অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান বিলি-বিতরণ করেন। জাতির সৌভাগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের কথায় কান দেন না। আরেক বিতর্কিতজন, বিএনপি-জামায়াতের বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত ফরহাদ মজহার ২০১২ সালের ১৫ জুলাই বাংলা নিউজ ২৪.কমে 'দুর্নীতি হয়েছে এটা বিশ্বব্যাংক একা বলেনি' শীর্ষক ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, 'এটাকে শুধু কেলেঙ্কারি বলা যাবে না। এটা একটা গুরুতর রাজনৈতিক ও নৈতিক অপরাধ বটে।' কত অধঃপতিত স্তরের চিন্তার ঘোরে থাকলে এমন ভঙ্গিমার বাক্য লিখতে হয়, তা সবার বোধগম্য হবে না। উত্তাল পদ্মার বুকে সেতু আজ বাস্তব, ফরহাদ মজহার তা স্বচক্ষে দেখে আসতে পরেন। দক্ষিণ বঙ্গে গিয়ে হারিয়ে যেতেও পারেন। এসব বকোয়াজ কথাবার্তা প্রশ্ন জাগায়, এরা আদৌ দেশ ও জনগণের স্বার্থে কথা বলে কি না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দেশের স্বার্থ মিলিত হয় না। এরা দেশের গৌরব, গরিমা, শৌর্যবীর্যকে মেনে নিতে পারে না। পূর্বপুরুষের রক্তের ধারা তাদের এসব অর্বাচীনতায় আবিষ্ট করে রাখে।

এখানে স্মর্তব্য, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসবিদ সিমিয়েল ওয়েড সানফ্রান্সিসকোর আইকনিক গোল্ডেন ব্রিজ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এই সেতুর প্রতীকী অর্থটি আমাদের বুঝতে হবে। কারণ সেতুটি কাউকে শুধু আমেরিকা থেকে আমেরিকায় নিয়ে যায় না, বরং এটি আমেরিকা থেকে অনেক দূরে তাকে নিয়ে যায়।' আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদের একাংশ কোনোভাবেই বাঙালি জাতির জাগরণ, উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, বিকাশকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। পদ্মা সেতু বাংলাদেশে থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে বাঙালিকে। যে দূরত্ব ভূগোলের নয়, বরং সম্ভাবনার, সক্ষমতার এবং স্বপ্নের। যে স্বপ্ন দেখেন শেখ হাসিনা, যে স্বপ্ন দেখান তিনি এবং তা বাস্তবায়নও করেন। বদরুদ্দীন উমর, ফরহাদ

মজহাররা দেশ আত্মনির্ভরশীল হতে চাওয়ার প্রত্যয় মেনে নিতে পারেন না। তাদের দেশ ও জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতাও নেই। আমরা দেখেছি, পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে বাংলাদেশ বিরোধিতাও প্রকট হয়ে উঠেছিল। যার সঙ্গে ডক্টরসহ নানাবিধজনের অপতৎপরতার জগতে আনাগোনা ব্যাপক হারে বেড়েছিল।

অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুব হোসেন বলেছেন, 'সরকারের উচিত ছিল আগে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বিষয়টি চুকিয়ে ফেলা।' (দৈনিক যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১২)। সত্যি এই দূরদর্শীদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলতে গেলে পদে পদে বিপদ। যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে দেখতে পেতেন 'গর্বের সেতু পদ্মা কীভাবে সাহসের দীপশিখা' হয়ে যায়।

২০১২ সালের ১ জুলাই প্রথম আলো পত্রিকায় এক প্রতিক্রিয়ায় অর্থনীতিবিদ ড. বিনায়ক সেন বলেছিলেন, 'গত এক বছরে আলাপ-আলোচনা করে বিশ্বব্যাংকের আস্থা আনতে পারত সরকার।' পদ্মা সেতু দেখলে ডক্টর সেন হয়তো বুঝতে পারবেন, বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীলতার অভিযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হতো তার কাছে যে, কেন অবৈধ মিথ্যা অভিযোগ করল বিশ্বব্যাংক। আর মাথা নত করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে বাংলাদেশ? বিশ্বব্যাংকের কনসালটেন্সি এত আরামের যে, কখন দাসত্বের মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, নিজেও বুঝতে পারেন না।

প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ২০১১ সালের ১ জুলাই ডেইলি স্টারে লিখছেন, 'পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ, বাংলাদেশ বিষয়ে দাতা দেশগুলোর মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করেছে।'

সাবেক সচিব ফায়জুল কবির খান ২০১২ সালের ১৪ জুলাই প্রথম আলোয় লিখেছিলেন, 'দেশীয় অর্থ থেকে পদ্মা সেতু করলে শিক্ষাব্যবস্থার মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' আজ পদ্মা সেতু দেখে তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারছেন সব খাতে সমন্বয় করেই নির্মিত হয়েছে পদ্মা সেতু।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হওয়ার আগে ড. আইনুন নিশাত বলেছিলেন, 'পদ্মা সেতুর মতো বড়ো প্রকল্পগুলোর ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তির দলিলাদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা না হলে ভবিষ্যতে খারাপ হবে।' সেই তিনি এখন বলেন, 'পদ্মা সেতুর প্রকৌশল ছিল অসম্ভব চ্যালেঞ্জের। পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশ্বের জন্য একটা বড়ো রাজনৈতিক মেসেজ। বিশ্বব্যাংক যখন ঋণ দিতে আপত্তি করল, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, বিশ্বব্যাংক জড়িত থাকলে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা হতো, আমাদের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকাজে সেই গুণগত মানের ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করা না হয়। তাই অর্জিত হয়েছে।

নিজস্ব অর্থ দিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণদাতাদের সুদ পরিশোধ আর বিদেশি ঋণদাতাদের সুদ পরিশোধ এক নয়। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অর্থনীতিতে অব্যবহৃত সম্পদ বেশি থাকে। ঘাটতি সংস্থান মূলস্ফীতি সৃষ্টি নাও করতে পারে। বিশেষত অর্থ যদি ভালো উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োজিত হয়। তাই পদ্মা সেতু নিয়ে প্রশ্ন তোলা কঠিন। এছাড়া এটা তো বাস্তব, বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদি। সেভাবেই দেখা সংগত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকারের প্রবণতা পরিহার করতে হবে।' বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন, 'নিজস্ব অর্থায়নে সরকার পদ্মা সেতু করার যে পরিকল্পনা করছে, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তবে সরকার ইচ্ছা করলে পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু শেষ করতে পারবে না, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে পারবে না। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে গেলে দেশের তারল্য সংকট ভয়াবহ রূপ নেবে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দেবে।' গভর্নর সাহেব, এখন, নিশ্চয় উপলব্ধি করছেন, তার চিন্তাভাবনা কত পশ্চাৎপদ ছিল। অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে কত দূরে অবস্থান করে আসছেন। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনও বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তাদের সব আশঙ্কাকে অসত্য প্রমাণ করে নিরুপদ্রবে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। আর যারা বিরূপ সমালোচনা, দেশে-বিদেশে সেতুবিরোধী তৎপরতা চালিয়েছে, তাদের মুখোশ যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনই ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের জন্য, প্রকল্পে অর্থ বন্ধ ও অসত্য অভিযোগ আনায়।

পদ্মা বহুমুখী সেতু নিয়ে যারা বিরোধিতা করেন, তারা দেশ ও জাতির শত্রু বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, পদ্মা সেতু আমাদের জাতীয় সম্পদ। আমাদের অহংকার। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিরোধিতাকারীরা, উন্নয়নের বিরুদ্ধে যারা থাকেন, তারা দেশ ও জাতির শত্রু। তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। পদ্মা সেতু নিয়ে দুর্নীতির মিথ্যা গল্প সৃষ্টির নেপথ্যে ষড়যন্ত্রে যুক্ত প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করতে কমিশন গঠন প্রশ্নে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংকের আচরণটি ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের নিদর্শন। তাদের অযৌক্তিক অনেক শর্ত পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক জান্তা শাসক এমনকি বিএনপি-জামায়াত জোটও মেনে চলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের কাছে মাথা নত করেননি। সাহসের বরাভয় কাঁধে স্বাধীনতার পর বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ঋণ দেওয়ার শর্ত নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলে বঙ্গবন্ধু শুনিয়েছিলেন, 'শুনেছি আপনারা বলেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে দাতা মহলের শর্ত মানতে হয় আগে। এই যদি হয়ে থাকে আপনাদের শর্ত, তবে কোনো সাহায্যই আমরা নেব না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনেছে। এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, আমাদের বাঁচতে হলে, জনগণের সে শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বাঁচতে হবে। আমরা আপনাদের সাহায্য ছাড়াই চলব।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার সেই অবস্থান ভুলে যাননি। আর তাই অবলীলায় নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে এবং তা বাস্তবায়ন করে পুরো বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন, বাঙালি পারে। যে বাঙালি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দেশ স্বাধীন করেছে, সে বাঙালি সেতু বানাতে পারে। দেশ হতে পারে উন্নয়নশীল। তাঁর এই দৃঢ়তাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না স্থিতাবস্থা বজায় রেখে, দেশ ও জাতিকে হতশ্রী পর্যায়ে নামিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভকারী কথিত শিক্ষিতজনরা। তাদের অর্বাচীন আস্ফালন বাতাসে মিলিয়ে যাবেই; কিন্তু পদ্মা সেতু থাকবে অবিচল জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পাদপ্রদীপ হয়ে। পদ্মা সেতু আজ এক বাস্তবতা। এপার-ওপার দুপার আজ মিলেছে সেতুবন্ধে। সেতু নির্মাণের বিরোধিতার নামে দেশের বিরোধিতাকারীদের আস্ফালন স্তব্ধ হয়েছে। বাঙালি জাতি আত্মনির্ভরশীলতার অভিযাত্রায় আরও বহুদূর যাবে নিন্দুকের সব নিন্দামন্দ উপেক্ষা করে। যারা পদ্মা সেতু নিয়ে ষড়যন্ত্র এবং বিরোধিতা করেছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তারা ঘৃণিত হয়েই থাকবে।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক; কবি ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ঁজাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে সরকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সিনেমা হল (সিনেপ্লেক্স) নির্মাণ করতে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

২৩ মার্চ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০' বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্রশিল্পীদের সর্বোচ্চ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু। স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেন। এর আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০-এর পুরস্কারপ্রাপ্ত ২৭টি ক্যাটাগরিতে ৩২ জনের নাম ঘোষণা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এক হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে রেখেছি। আমি চাই, আমাদের জেলা-উপজেলায় এই সিনেমা হল বা সিনেপ্লেক্স নির্মাণ হোক। সেখানে যেন আধুনিক প্রযুক্তিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতে পারে। এছাড়া আমরা চলচ্চিত্রের জন্য আর্কাইভ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করে দিয়েছি।'

একনজরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০

আজীবন সম্মাননা–আনোয়ারা বেগম ও রাইসুল ইসলাম আসাদ। শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: আড়ং (জান্নাতুল ফেরদৌস), শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় (সৈয়দ আশিক রহমান), শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (যুগ্ম): গোর (ফরিদুর রেজা সাগর ও গাজী রাকায়েত) ও বিশ্বসুন্দরী (অঞ্জন চৌধুরী)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্র: সিয়াম আহমেদ।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্র: রোজালিন দীপান্বিতা মার্টিন (গোর)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্বচরিত্র: ফজলুর রহমান বাবু (বিশ্বসুন্দরী), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্বচরিত্র: অপর্ণা ঘোষ (গণ্ডি)। শ্রেষ্ঠ

অভিনেতা খলচরিত্রে: মিশা সওদাগর (বীর), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক: বেলাল খান (হৃদয়জুড়ে), শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক: প্রয়াত সহিদুর রহমান (বিশ্বসুন্দরী), শ্রেষ্ঠ গায়ক ও শ্রেষ্ঠ সুরকার: ইমরান মাহমুদুল (বিশ্বসুন্দরী)। শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম): দিলশাদ নাহার কনা (বিশ্বসুন্দরী) ও সোমনূর মনির কোনাল (বীর)। শ্রেষ্ঠ গীতিকার: কবির বকুল (বিশ্বসুন্দরী)। শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী: মুগ্ধতা মোরশেদ ঋদ্ধি (গণ্ডি)। শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার: শাহাদৎ হোসেন বাঁধন (আড়ং)। শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার: গাজী রাকায়েত (গোর)।

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার: গাজী রাকায়েত উল্লাহ নিয়াজ (গোর)। শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা: ফাখরুল আরেফিন খান (গণ্ডি), শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক: কাজী সেলিম আহম্মেদ (গোর) ও শ্রেষ্ঠ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম (গোর)।

শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা: এনামতারা বেগম, শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক: উত্তম কুমার গুহ (গোর)। শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক (যুগ্ম): পঙ্কজ পালিত ও মাহবুব (গোর)। শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান মোহাম্মদ আলী বাবুল (গোর)। (সূত্র: ২৪ মার্চ ২০২২, কালের কণ্ঠ ও প্রথম আলো)

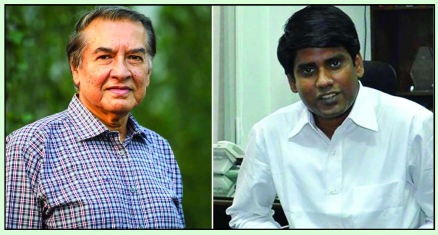

সম্পাদক পরিষদের নতুন কমিটি
মাহফুজ আনাম সভাপতি হানিফ মাহমুদ সম্পাদক

সম্পাদক পরিষদের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। দুই বছর মেয়াদি এ কমিটিতে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ।

সহসভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবীর ও ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদে ঢাকা ট্রিবিউন সম্পাদক জাফর সোবহান। কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী। কমিটির সদস্যরা হলেন ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, আজকের পত্রিকা সম্পাদক ড. মো. গোলাম রহমান, যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, করতোয়া সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক এবং দৈনিক আজাদী সম্পাদক এমএ মালেক।

৬ মার্চ রাজধানীর ফার্মগেটে ডেইলি স্টার ভবনে মাহফুজ আনামের সভাপতিত্বে পরিষদের সভায় এ কমিটি গঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।

সভার শুরুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রয়াত রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, মানবজমিনের সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, আজকের পত্রিকার সম্পাদক ড. মো. গোলাম রহমান, ইনকিলাব সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দিন, ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, জাফর সোবহান এবং সমকালের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি। অনলাইনেও যুক্ত ছিলেন সদস্যরা। ড. মো. গোলাম রহমানকে সদস্য এবং মুস্তাফিজ শফিকে সহযোগী সদস্য হিসাবে পরিষদে অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করা হয় সভায়। (সূত্র: ৮ মার্চ ২০২২, সমকাল)

বিশ্ব বেতার দিবস

বিশ্ব বেতার দিবস ছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য: 'সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি'।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে বিশ্ব বেতার দিবস পালিত হচ্ছে। যেখানে বাংলাদেশ বেতার, প্রাইভেট এফএম এবং কমিউনিটি রেডিয়ো অংশগ্রহণ করছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

সারাবিশ্বে বেতার এখনো অন্যতম জনপ্রিয় গণমাধ্যম। বেতারের রয়েছে পৃথিবীর দুর্গম স্থানে পৌঁছানোর শক্তি। গ্রামগঞ্জ ও দুর্গম এলাকায় এখনো বেতার তথ্য আদান-প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বেতারকেন্দ্র।

এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বাধার মুখে ৮ মার্চে বেতারে প্রচার করা, মুক্তিকামী বাঙালিকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশ বেতার সব সময় এদেশের জনগণের পাশে থেকেছে। বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিয়োর সাফল্যও অনেক। দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিয়োবিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে নতুন ধারার এ গণমাধ্যমটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। (সূত্র: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, দৈনিক ইত্তেফাক)

ডিইউজের সভাপতি সোহেল হায়দার সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে সভাপতি পদে সোহেল হায়দার চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে আকতার হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন। ২৯ মার্চ রাতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

অন্য পদে বিজয়ীরা হলেন জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এমএ কুদ্দুস, সহসভাপতি মানিক লাল ঘোষ, যুগ্মসম্পাদক খায়রুল আলম, কোষাধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ জিহাদুর রহমান, আইনবিষয়ক সম্পাদক এসএম সাইফ আলী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রাজু হামিদ, দপ্তর সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান, কল্যাণ সম্পাদক জুবায়ের রহমান চৌধুরী, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাকিলা পারভীন এবং নারীবিষয়ক সম্পাদক সুরাইয়া অনু।

নির্বাচিত আটজন সদস্য হলেন মুজিব মাসুদ, দুলাল খান, ইব্রাহিম খলিল, আসাদুর রহমান, সলিম উল্লাহ, আনোয়ার হোসেন, মহিউদ্দিন পলাশ ও রেহানা পারভীন। (সূত্র: ৩০ মার্চ ২০২২, প্রথম আলো)

কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি বাবুল সম্পাদক রুবেল

কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে সভাপতি পদে সমকালের মো. আনোয়ারুল

কবীর বাবুল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে দৈনিক ইত্তেফাকের মো. রুবেল হাওলাদার নির্বাচিত হয়েছেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে সংগঠনের কার্যালয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া সিনিয়র সহসভাপতি রায়হান মোর্শেদ, সহসভাপতি শুভ্র সিনহা রায় রনি, সিনিয়র সহসাধারণ সম্পাদক সানাউল ইসলাম টিপু, সহসাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মাহবুব হাসান রানা, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক পদে আজিজুর রহমান শাহ নির্বাচিত হয়েছেন। সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন একেএম খায়রুল কবীর, মো. হাফিজউদ্দিন, রবিউল ইসলাম রবি ও মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান বিপ্লব।

নির্বাচনে আইনজীবী মোসলেহ উদ্দিন জসীম প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাকে সহযোগিতা করেন অপর দুই কমিশনার সরদার নজরুল ইসলাম ও আসাদুজ্জামান খান রচি। (সূত্র: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, সমকাল)

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সাংবাদিক নেতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতারা।

২৬ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, যুগ্মসম্পাদক মাঈনুল আলম ও আশরাফ আলী, কোষাধ্যক্ষ শাহেদ চৌধুরী, সদস্য আইয়ুব ভূইয়া, শাহনাজ সিদ্দিকী সোমা ও ভানুরঞ্জন চক্রবর্তী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম, সিনিয়র সদস্য বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদসহ জ্যেষ্ঠ সদস্যরা। (সূত্র: ২৭ মার্চ ২০২২, সমকাল)

সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন

সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন (মঞ্জু)। তিনি এর আগে সমকালের কনটেন্ট কনসালট্যান্ট (আধেয় পরামর্শক) এডিটর ছিলেন।

মোজাম্মেল হোসেন ১৯৬৯ সালে ছাত্রাবস্থায় সাপ্তাহিক যুগবাণী ও ১৯৭০ সালে সাপ্তাহিক একতায় রিপোর্টার হিসাবে পেশা শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর থেকে প্রয়াত বজলুর রহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মুক্তিযুদ্ধ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি দৈনিক ভোরের কাগজের বার্তা সম্পাদক, প্রথম আলোর বার্তা সম্পাদক ও উপসম্পাদক, সমকালের উপসম্পাদকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং আমাদের সময় ও সকালের খবরের সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন। (সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০২১, সমকাল)

প্রেস ক্লাবের ইজিএম

সাংবাদিকতা পেশায় অসামান্য অবদান রাখায় ছয় খ্যাতিমান সাংবাদিককে আজীবন সদস্যপদ দিয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাব। এছাড়া দুজন সাংবাদিককে মরণোত্তর অনারারি সদস্যপদ দেওয়া হয়। এ ছয় সাংবাদিক জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য।

গত ৩১ ডিসেম্বর ক্লাবের অতিরিক্ত সাধারণ সভায় (ইজিএম) এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, বর্ষীয়ান তিন সাংবাদিক আমান উল্লাহ, কামরুজ্জামান ও মৃণাল কৃষ্ণ রায়কে আজীবন সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে তা অনুমোদন করা হয়। ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরী এ সময় সাবেক দুই সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কামাল উদ্দিন এবং এএসএম হাবিবুল্লাহকে আজীবন সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব করলে তাও অনুমোদন করা হয়। ক্লাবের সাবেক সভাপতি হাসান শাহরিয়ারকে মরণোত্তর অনারারি সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল। আরেকজন সাবেক সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদকে মরণোত্তর অনারারি সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ। এ দুই প্রস্তাবও অনুমোদন পেয়েছে।

অতিরিক্ত সাধারণ সভায় ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, কোষাধ্যক্ষ শাহেদ চৌধুরী নিজ নিজ রিপোর্ট ও যুগ্ম সম্পাদক মাঈনুল আলম ২০২০ সালের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্টের ওপর আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম, বিএফইউজে সভাপতি ওমর ফারুক, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভূইয়াসহ তরুণ তপন চক্রবর্তী, সৈয়দ শাহনেওয়াজ করিম, একেএম মহসীন, শাহীন উল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। সভায় প্রেস ক্লাবের সামনে নির্মাণাধীন মেট্রোরেল স্টেশনের নাম জাতীয় প্রেস ক্লাব স্টেশন করার দাবি জানান সদস্যরা। (সূত্র: ১ জানুয়ারি ২০২২, সমকাল)

মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন ২২ জন

বাংলাদেশে শিশু অধিকার নিয়ে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রথম আলোর একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, দুই ফটোসাংবাদিকসহ ২২ জন পেয়েছেন মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস। জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফ ২০০৫ সাল থেকে এ অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে। গত ২০ ডিসেম্বর এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

শিশুদের অধিকার এবং তাদের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য ইউনিসেফ সাংবাদিকদের এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে ইউনিসেফের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, বিশ্বের শিশুদের জন্য কাজের অর্জন এবং যেসব কাজ এখনো বাকি, সেগুলো তুলে ধরা হয়।

এ বছর ৭০০ প্রতিযোগীর মধ্য থেকে ২২ জনকে নির্বাচন করা হয়। আয়োজনের অন্যতম বিচারক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের

অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, এ বছর অনেক ভালো প্রতিবেদন জমা পড়েছিল। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে আরও বেশি শিশু-সংবেদনশীল, নৈতিকতাসমৃদ্ধ প্রতিবেদন হবে।

মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২১-এ টেক্সট ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার ঢাকা ট্রিবিউনের কোহিনুর খৈয়াম, দ্বিতীয় পুরস্কার এনটিভির মো. খায়রুল বাশার আশিক এবং তৃতীয় পুরস্কার পান নিউজবাংলা টোয়েন্টিফোর ডটকমের মো. বনি আমিন ও দ্য বিজনেস স্ট্যামফোর্ডের উম্মে মারজানা।

আলোকচিত্রে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন দৈনিক অধিকারের ইমরান হোসেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর দীপু মালাকার ও মো. সাজিদ হোসেন। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন দ্য ডেইলি স্টারের প্রবীর দাস।

ভিডিয়ো ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন একাত্তর টিভির নাদিয়া শারমিন, দ্বিতীয় সময় টিভির মারজিয়া হাশমি মম এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন জিটিভির ইসমাইল হোসেন জুয়েল।

বিশেষ মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড টেক্সটভিত্তিক ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর সামছুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের নিলিমা জাহান, ঢাকা পোস্টের আদনান রহমান ও জসিম উদ্দিন এবং বাংলা ট্রিবিউনের মো. শাহেদুল ইসলাম।

শিশুদের মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড (১৮ বছরের নিচে) টেক্সট ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের রাফসান নিঝুম, দ্বিতীয় প্রথম আলোয় প্রকাশিত লেখার জন্য মো. সাজ্জাদুর রহমান এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন আজকের গোপালগঞ্জের পিয়াল সাহা।

এছাড়া ১৮ বছরের নিচে ভিডিয়ো ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে এটিএন বাংলার আফরিন আক্তার, ফাহমিদা ফাইজা ও তাহমিনা ফ্লোরা। (সূত্র: ২১ ডিসেম্বর ২০২১, প্রথম আলো)

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক নাজনীন আখতার, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি সফি খানসহ নয়জন সাংবাদিক। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন করে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিল্ডিং বেটার ফিউচার ফর গার্লস প্রকল্পের আওতায় এই মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত সুইডেন দূতাবাসের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ।

আঞ্চলিক ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন জহিরুল ইসলাম (এসএ টিভি), শাকিল মুরাদ, মাসুদুর রহমান (আজকের পত্রিকা)। জাতীয় ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন শাহেদ শফিক (বাংলা ট্রিবিউন), নীলিমা জাহান (দ্য ডেইলি স্টার), সাজ্জাদ পারভেজ (যমুনা টিভি), নাজনীন আখতার (প্রথম আলো) ও জাহাঙ্গীর আলম (জাগো নিউজ ২৪)।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সাংস্কৃতিক কর্মী শাহনাজ খুশি, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পরিচালক (গার্লস রাইটস) কাশফিয়া ফিরোজ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও সাংবাদিক জ ই মামুন। (সূত্র: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, প্রথম আলো)

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির বর্ষসেরা পুরস্কার প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) ছয় সাংবাদিক বর্ষসেরা রিপোর্টার-২০২১ নির্বাচিত হয়েছেন। ১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ডুজার নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্‌বোধন, বর্ষসেরা রিপোর্টারের পুরস্কার বিতরণ ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে ঢাবি ক্যাম্পাসে কর্মরত ছয় সাংবাদিককে বর্ষসেরা পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলা ও ইংরেজি প্রিন্ট এবং অনলাইন ক্যাটাগরিতে দুটি ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে দুইজন করে মোট ছয়জন এ পুরস্কার পান।

পুরস্কারপ্রাপ্ত রিপোর্টাররা হলেন: ইত্তেফাকের আরেফিন শরিয়ত, প্রথম আলোর আসিফ হাওলাদার, জাগো নিউজের আল সাদী ভূঁইয়া, নিউ এজের ওবায়দুর রহমান সোহান, ডেইলি সানের মোহাম্মদ রায়হান ও বাংলা ট্রিবিউনের সিরাজুল ইসলাম রুবেল। (সূত্র: ৩ এপ্রিল ২০২২, দৈনিক ইত্তেফাক)

স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক ফোরামের পুরস্কার প্রদান

কাজের স্বীকৃতি হিসাবে সাত সাংবাদিককে পুরস্কৃত করেছে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক ফোরামের (এসইউজেএফ) আয়োজনে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, সম্মাননা ও উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। গণমাধ্যমে কর্মরত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের জন্য এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। জুরি বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

২০২০ সালের জন্য ডেইলি স্টারের ডেপুটি চিফ রিপোর্টার আল-মাসুম মোল্লা, নিউ এজের সিনিয়র রিপোর্টার আহম্মদ ফয়েজ, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার জাহিদুর রহমান এবং ২০২১ সালের জন্য চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সিনিয়র রিপোর্টার মোর্শেদ হাসিব, বিবিসির সানজানা চৌধুরী, যমুনা টিভির সিনিয়র রিপোর্টার হাবিব রহমান ও ইনডিপেনডেন্ট টিভির ওমর ফারুক পুরস্কার পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রুমানা হক রিতা, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইউনুছ মিয়া, সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী আব্দুল মান্নান, রেজিস্ট্রার আব্দুল মতিন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু, সাম্প্রতিক দেশকালের সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ, শিক্ষক মোশাররফ হোসেন, সামিয়া আসাদী, সাংবাদিক তপন মাহমুদ লিমন, সাইফুল মাছুম, সানমুন আহমেদ, সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি হাসান ওয়ালী ও সাধারণ সম্পাদক আকরাম হোসেন। (সূত্র: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২, সমকাল)

২০২১ সালে বিশ্বে ৪৫ সাংবাদিক হত্যা

বিশ্বজুড়ে ২০২১ সালে ৪৫ জন সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট (আইএফজে) ৩১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। আইএফজে হিসাব অনুযায়ী, এই সংখ্যা সবচেয়ে কম বছরওয়ারি হত্যার একটি। আইএফজের বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতির মধ্যে সাংবাদিক হত্যার হার কমে আসা কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক। সম্প্রতি আরেক আন্তর্জাতিক মিডিয়া নজরদারি সংস্থা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) ২০২১ সালে বিশ্বজুড়ে ৪৬ জন সাংবাদিক নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। আইএফজের তথ্য অনুসারে, গত বছর আফগানিস্তানে ৯ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, যা একক দেশ হিসাবে সর্বোচ্চ। এছাড়া পাকিস্তানে তিনজন, ভারতে চারজন ও মেক্সিকোতে আটজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। গত বছর এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২০ সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন। বৈশ্বিক অঞ্চলের হিসাবে এখানে নিহতের ঘটনা সবচেয়ে বেশি। আমেরিকা মহাদেশ অঞ্চলে ১০ ও আফ্রিকা মহাদেশে আট সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এ বছর ইউরোপে ছয়জন ও মধ্যপ্রাচ্যে এক সাংবাদিক নিহত হন। আইএফজের বিবৃতি অনুযায়ী, সাংবাদিক হত্যার ঘটনাগুলো ঘটেছে দুর্নীতি, অপরাধ ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রতিবেদন করার কারণে। তবে গত বছর সশস্ত্র সংঘাত বা যুদ্ধ প্রতিবেদন তৈরি করা সাংবাদিকদের মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। মনে করা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে মহামারি ও অন্যান্য কারণে সব সময় সংবাদকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবেদন করেননি বলেই এমনটা হয়েছে। (সূত্র: ২ জানুয়ারি ২০২২, কালের কণ্ঠ)

পুলিৎজার পুরস্কার

সাংবাদিকতাজগতের সর্বোচ্চ সম্মান হিসাবে খ্যাত এবারের পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট ও বার্তা সংস্থা রয়টার্স। পাশাপাশি নিজ দেশে চলমান যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশে 'সাহসিকতা, সহনশীলতা ও সত্যনিষ্ঠতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ' থাকায় সম্মান জানানো হয়েছে ইউক্রেনের সাংবাদিকদের। ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ১২ সাংবাদিকের প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়েছে পুলিৎজার বোর্ড। প্রথা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ৯ মে পুলিৎজার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে। সংবাদের জন্য তিনটি পুলিৎজার জিতে নিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস। এর মধ্যে প্রথমটি জিতেছে পুলিশ কর্তৃক গাড়ি থামানোর ঘটনার জেরে প্রাণনাশ হওয়ার সংবাদের জন্য, দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের জন্য, সেটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের আকাশযুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে। আর তৃতীয় পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে সালামিশাহ টিলেটের লেখা সমালোচনার জন্য। শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বর্ণবাদের উপস্থিতি নিয়ে লিখেছিলেন নিউইয়র্ক টাইমসের এ প্রদায়ক-সমালোচক। অন্যদিকে গত বছরের জানুয়ারিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থকদের কংগ্রেস ভবনে হামলা চালানোর খবর দিয়ে জনসেবা শ্রেণিতে পুরস্কার জিতেছে ওয়াশিংটন পোস্ট। করোনাভাইরাস মহামারির মুখে বিপর্যস্ত ভারতের ছবি তুলে ফিচার ফটোগ্রাফি শ্রেণিতে পুরস্কার জিতেছে রয়টার্স এবং সংস্থাটির একদল আলোকচিত্রী। ওই আলোকচিত্রীদের মধ্যে গত বছর তালেবানের হাতে নিহত দানিশ সিদ্দিকীও রয়েছেন। অন্যরা হলেন আদনান আবিদি, সানা ইরশাদ মাত্তু ও অমিত দেব। প্রথম পুলিৎজার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। (সূত্র: ১১ মে ২০২২, কালের কণ্ঠ)

১১ সাংবাদিক পেলেন বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২১ পেয়েছেন ১১ সাংবাদিক। ৩০ মে রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে জমকালো অনুষ্ঠানে তাদের হাতে পুরস্কারের অর্থ, সনদপত্র ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

একই অনুষ্ঠানে মফস্‌সলের সাংবাদিকতায় অবদান রাখা ৬৪ জন প্রবীণ ও গুণী সাংবাদিককে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান।

গত বছর প্রকাশিত ও প্রচারিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১১ জনকে বাছাই করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন মুক্তিযুদ্ধ ক্যাটাগরিতে ডেইলি স্টারের আহমাদ ইশতিয়াক, মাছরাঙা টেলিভিশনের কাওসার সোহেলী, জাগো নিউজের সালাহ উদ্দিন জসিম, অপরাধ ও দুর্নীতি ক্যাটাগরিতে দেশ রূপান্তরের শোয়েব চৌধুরী, জিটিভির জান্নাতুল ফেরদৌসী, নিউজ বাংলার জেসমিন পাপড়ি (অনলাইন), নারী ও শিশু ক্যাটাগরিতে সমকালের রাজীব আহাম্মদ, আনন্দ টিভির শওকত সাগর ও ঢাকা পোস্টের আদনান রহমান। অনুসন্ধানী প্রামাণ্যচিত্রে মাছরাঙা টেলিভিশনের মাজাহারুল ইসলাম এবং আলোকচিত্রে প্রথম আলোর দীপু মালাকার পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের পুরস্কারের অর্থমূল্য আড়াই লাখ টাকা।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ছাড়াও বক্তব্য দেন প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম ও জুরি বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক গোলাম রহমান।

সভাপতিত্ব করেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড কমিটির আহ্বায়ক সায়েম সোবহান আনভীর। (সূত্র: ৩১ মে ২০২২, সমকাল)

মেক্সিকোয় এ বছর ৫ সাংবাদিক খুন

মেক্সিকোতে চলতি বছরের প্রথম ছয় সপ্তাহে পাঁচজন সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন। সর্বশেষ ১০ ফেব্রুয়ারি হেবার লোপেজ ভাজকুয়েজ নামের একজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য ওক্সাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওক্সাকার সরকারি কৌঁসুলি আর্তুরো ক্যালভো বলেন, ঘটনার সময় লোপেজ নিজের গাড়িতে ছিলেন। লোপেজ একটি নিউজ পোর্টালে কাজ করতেন। ক্যালভো আরও বলেন, লোপেজ হত্যার ঘটনায় দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার এবং হত্যার কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কে তাদেরকে এ হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি। সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার বলছে, এ নিয়ে চলতি বছর মেক্সিকোতে পাঁচ সাংবাদিক হত্যার শিকার হলেন। গত বছর দেশটিতে অন্তত সাত সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। তবে তারা সবাই পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যার শিকার হয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সাংবাদিকদের জন্য মেক্সিকোকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ বলা হয়। (সূত্র: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, প্রথম আলো)

শোক সংবাদ

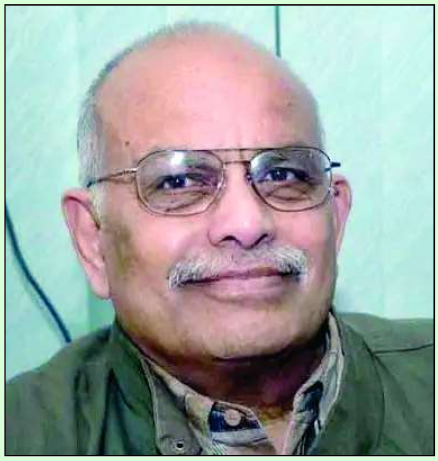

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'–ভাষার জন্য বাঙালির রক্তদানের স্মৃতি জড়ানো অমর এই গানের স্রষ্টা আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (৮৮) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ মে বাংলাদেশ সময় দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত্যু হয় প্রখ্যাত এই লেখক, সাংবাদিক ও কলামিস্টের। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী নানা ধরনের অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা রয়েছে তাঁর। ১৯৭৪ সালের পর থেকে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছিলেন তিনি। সেখানে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পক্ষে তাঁর কলম সোচ্চার ছিল বরাবর। প্রবাসে থেকেও ঢাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি যেমন রাজনৈতিক ধারাভাষ্য আর সমকালীন বিষয় নিয়ে একের পর এক নিবন্ধ লিখে গেছেন, তেমনই লিখেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধ।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশালের উলানিয়া গ্রামে। তাঁর বাবা ওয়াহিদ রেজা চৌধুরী, মা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন। তিন ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তিনি চার মেয়ে ও এক ছেলের জনক; এর মধ্যে তৃতীয় মেয়ে বিনীতা এপ্রিলে মারা গেছেন।

উলানিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ঢাকা কলেজ থেকে পাশ করেন ইন্টারমিডিয়েট। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

বাবার মৃত্যুর পর ১৯৪৬ সালে গ্রাম ছেড়ে বরিশাল শহরে চলে এসেছিলেন গাফ্‌ফার চৌধুরীর। তখন থেকেই তার লেখালেখির শুরু। স্কুলে পড়ার সময় কংগ্রেস নেতা দুর্গা মোহন সেন সম্পাদিত কংগ্রেস হিতৈষী পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। পরে তিনি দৈনিক ইনসাফ, দৈনিক সংবাদ, মাসিক সওগাত, মাসিক নকীব, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক জয় বাংলাসহ বহু পত্রিকার সঙ্গে ছিলেন। ছয় দশকের বেশি সময় ধরে ভিমরুল, তৃতীয় মত, কাছে দূরে, একুশ শতকের বটতলায়, কালের আয়নায়, দৃষ্টিকোণ শিরোনামে নিয়মিত কলাম লিখেছেন তিনি।

তরুণ বয়সে বহু কবিতা লেখা গাফ্‌ফার চৌধুরীর প্রথম বইটি ছিল শিশুদের জন্য। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত সেই বইয়ের নাম ছিল 'ডানপিটে শওকত'। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কৃষ্ণপক্ষ' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'। 'নাম না জানা ভোর', 'নীল যমুনা', 'শেষ রজনীর চাঁদ', 'সম্রাটের ছবি', 'সুন্দর হে সুন্দর', 'বাংলাদেশ কথা কয়' তাঁর লেখা বইগুলোর অন্যতম। তাঁর লেখা নাটকের মধ্যে রয়েছে 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ', 'একজন তাহমিনা' ও 'রক্তাক্ত আগস্ট'। তাঁর লেখা রাজনৈতিক উপন্যাস 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি'।

সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার, মানিক মিয়া পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

শহিদমিনারে সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তাঁর দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর জাতীয় প্রেস ক্লাবে তৃতীয় জানাজা ও সাংবাদিকদের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তাঁকে মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্ত্রী সেলিমা আফরোজের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

পীর হাবিবুর রহমান

বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান (৫৮) আর নেই। ৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন

(ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনার ও জাতীয় প্রেস ক্লাবে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাকে সুনামগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে মা-বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

পীর হাবিবুর রহমান ১৯৬৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ শহরে রইচ আলী পীর ও সৈয়দা রহিমা খানমের ঘরে জন্ম নেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পড়াকালে ১৯৮৪ সালে সাংবাদিকতায় তার হাতেখড়ি। ১৯৯২ সালে বাংলাবাজার পত্রিকার মাধ্যমে তার পেশাজীবন শুরু হয়। এরপর দৈনিক যুগান্তর, আমাদের সময়, আমাদের অর্থনীতি হয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনে কাজ করেন। তিনি নিউজ পোর্টাল পূর্বপশ্চিমবিডি.নিউজের প্রতিষ্ঠাতা। পীর হাবিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি উপন্যাস ও কবিতা লিখতেন।

কে জি মোস্তফা

প্রখ্যাত গীতিকার ও সাংবাদিক কে জি মোস্তফা (৮৫) আর নেই। তিনি ৮ মে রাজধানীর আজিমপুরে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইনালিল্লাহি...রাজিউন)। 'তোমারে লেগেছে এতো যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে' এবং 'আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন'সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের এই সদস্য।

কে জি মোস্তফার জন্ম ১৯৩৭ সালের ১ জুলাই নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। দৈনিক ইত্তেহাদে ১৯৫৮ সালে শিক্ষানবিশ হিসাবে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। ১৯৭৬ সালে তিনি

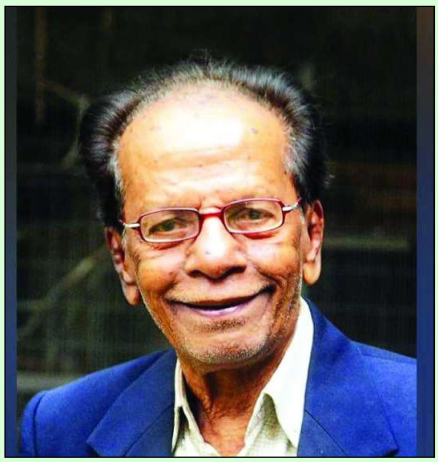

বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারভুক্ত হন এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৯৬ সালে সিনিয়র সম্পাদক (যুগ্ম সচিব পদমর্যাদা) হিসাবে অবসর নেন। অনেক সিনেমার সহকারী পরিচালক হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি। তার রয়েছে বেশকিছু কাব্যগ্রন্থ, গানের সিডি ও ক্যাসেট। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের 'দেশবরেণ্য গীতিকার' পদকসহ আরও বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি।

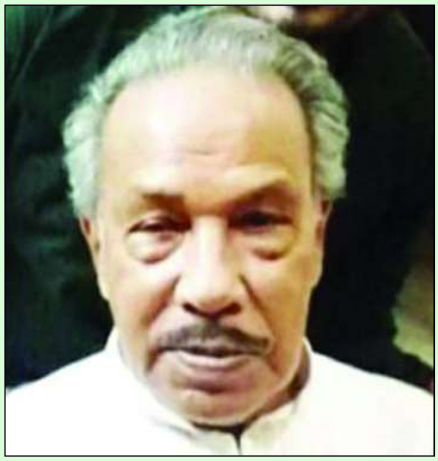

এ এম মুফাজ্জল

দ্য নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক এ এম মুফাজ্জল (৮৯) ২৬ ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের মসজিদে জানাজার পর তার লাশ উত্তরা ৪নং সেক্টর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে এ এম মুফাজ্জলের জন্ম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি দ্য বাংলাদেশ অবজারভার, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দ্য মর্নিং সান, দ্য ডেইলি নিউজ, দ্য ইনডিপেনডেন্ট, দ্য মর্নিং নিউজসহ বিভিন্ন ইংরেজি দৈনিকে কাজ করেছেন।

শামসুল আলম

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সদস্য ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক নগর সম্পাদক শামসুল আলম বেলাল (৬৪) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আরেকটি জানাজা শেষে তার লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দিলারা হাশেম

কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক দিলারা হাশেম (৮৬) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১৯ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দিলারা হাশেমের জন্ম ১৯৩৬ সালের ২১ আগস্ট যশোরে। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার প্রথম উপন্যাস 'ঘর মন জানালা'। সুভাষ দত্তের পরিচালনা ও চিত্রনায়িকা কবরীর প্রযোজনায় তা পরবর্তী সময়ে 'বলাকা মন' নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। ১৯৮২ সালে তিনি ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগে যোগ দেন।

শামীম মাশরেকী

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য, ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের সাবেক কর্মকর্তা ও ডিস্ট্রিক্টনিউজ২৪-এর উপদেষ্টা শামীম মাশরেকী (৫৫) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। গত ২৩ নভেম্বর ট্রেনে ঈশ্বরগঞ্জ থেকে ঢাকা আসার পথে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। জিআরপি পুলিশ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা সদরে মা-বাবার কবরের পাশে তার লাশ দাফন করা হয়।

খন্দকার আনিছুর রহমান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও দৈনিক বাংলাদেশের খবরের সম্পাদনা সহকারী খন্দকার আনিছুর রহমান (৫৮) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৭ জানুয়ারি রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৮ জানুয়ারি জানাজা শেষে রাজধানীর

রায়েরবাজার কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। আনিছুর রহমান দৈনিক খবর, সংবাদ, ডেসটিনি, অর্থনীতি প্রতিদিনসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় কাজ করেছেন।

মোস্তফা কামাল পাশা

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, চট্টগ্রামের সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য, উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও কলামিস্ট মোস্তফা কামাল পাশা (৬৮) ১৫ এপ্রিল নগরের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিন দফা জানাজা শেষে হাটহাজারীর ধলই গ্রামে স্থানীয় কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। মোস্তফা কামাল পাশা ১৯৫২ সালে ধলই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক আজাদীতে শুরু করেন সাংবাদিকতা। পরে তিনি ইপিবি নামের সংবাদ সংস্থার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখতেন। তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ঠিকানা লাশকাটা ঘর' (বড়োদের), 'ভয় নেই আমরা আছি' (ছোটোদের), প্রকাশিত উপন্যাস 'নীল বিষের ছোঁয়া, 'চন্দ্রিমা', 'উড়ক্কু পোকামাকড়' উল্লেখযোগ্য।

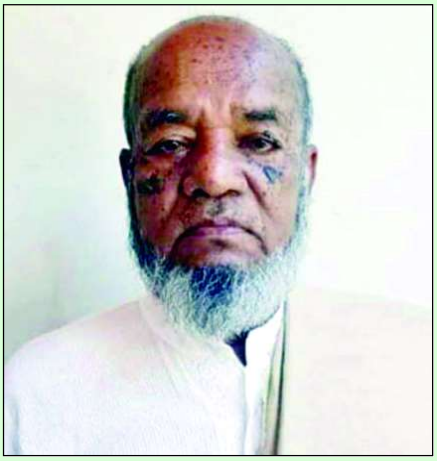

বদিউল আলম

দৈনিক কালবেলার বিশেষ সংবাদদাতা বদিউল আলম (৬৫) ৩১ মার্চ রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১ এপ্রিল বাদ জুমা জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার তিতাস থানার শাহাপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বদিউল আলমের জন্ম ১৯৫৬ সালে কুমিল্লার তিতাসের সাহাপুর গ্রামে।

সাগর বিশ্বাস

ইংরেজি দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সাগর বিশ্বাস (৫৯) পরলোক গমন করেছেন। ২২ ফেব্রুয়ারি যাত্রাপথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মিরপুর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে যান সহকর্মীরা। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিনের কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। রাতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে শ্রদ্ধা শেষে তার লাশ চট্টগ্রামে নিজ গ্রামে নেওয়া হয়। সেখানেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য।

হারুনুর রশীদ

চট্টগ্রামের পটিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক হারুনুর রশীদ ছিদ্দিকী (৬৪) ২ জানুয়ারি উপজেলার জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের উজিরপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। বাদ আসর জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। হারুনুর রশীদ ছিদ্দিকীর জন্ম ১৯৫৮ সালে। সাংবাদিকতা শুরু দৈনিক স্বাধীন পত্রিকার মাধ্যমে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দৈনিক ইত্তেফাক ও পূর্বকোণের পটিয়া প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

মহিউদ্দিন সরকার (নাঈম)

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় ১৩ এপ্রিল রাত সাড়ে ৮টার দিকে আততায়ীর গুলিতে মহিউদ্দিন সরকার (নাঈম) নামে এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা শংকুচাইলে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, তিনি মাদক কারবারিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

নিহত মহিউদ্দিন (২৭) স্থানীয় একটি পত্রিকা ও একটি সরকারি-বেসরকারি টিভির ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মালাপাড়া ইউনিয়নের অলুয়া গ্রামে।

জিল্লুর রহিম আজাদ

দৈনিক কালবেলার সিনিয়র রিপোর্টার জিল্লুর রহিম আজাদ (৬৪) ৯ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৪ মার্চ তার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার বৈঠার পাড় মিঞাবাড়িতে তার লাশ দাফন করা হয়। এর আগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে তাকে শ্রদ্ধা জানান সহকর্মীরা। জিল্লুর রহিম আজাদ ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি ফেনী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পথ'-এ স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে ১৯৮৯ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

আবুল বাশার নুরু

দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের প্রধান প্রতিবেদক আবুল বাশার নুরু (৫৭) ১৮ মার্চ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

ফরিদপুরের বোয়ালমারীর বাইবীর বনচাকী দাখিল মাদ্রাসা কবরস্থানে মায়ের কবরে তার লাশ দাফন করা হয়। তিনি দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে দৈনিক রূপালী, বাংলাবাজার পত্রিকা, আমাদের সময়, আমাদের অর্থনীতি, সংবাদ সারাবেলাসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। তিনি ডিআরইউর সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন।

সোহেল আহমেদ জীবন

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সুখময় সরকারের সরকারি গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মোটরসাইকেল আরোহী সিংড়ার স্থানীয় সাংবাদিক সোহেল আহমেদ জীবন (৩৩) নিহত হয়েছেন। ৯ মে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের সিংড়া উপজেলার নিংগইন তেল পাম্প এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহেল আহমেদ জীবন বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক দুরন্ত সংবাদ পত্রিকার সিংড়া উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন। এছাড়াও তিনি আগপাড়া শেরকোল বন্দর উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। নিহত সোহেল আহমেদ জীবন পৌর শহরের বালুয়া বাসুয়া মহল্লার মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে।

হাবীবুর রহমান

সময়ের আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হাবীবুর রহমান (৩৪) এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ১৮ জানুয়ারি রাত আড়াইটার দিকে রাজধানীর হাতিরঝিল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ জানিয়েছে, তিনি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

শফিকুল ইসলাম ইউনুস

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম ইউনুস (৭০) ৩১ মে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের দুলচাপুর নিজ গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কৃতী ছাত্র শফিকুল ইসলাম ইউনুস সাংবাদিকতা ছাড়াও একজন লেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। তিনি দৈনিক 'ঢাকা'-এর প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন।

হাফিজুর রহমান

দৈনিক ইনকিলাবের সাবেক চিফ নিউজ কো-অর্ডিনেটর এসএম হাফিজুর রহমান (৮০) ৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তার বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলায়। জানাজা শেষে সাতক্ষীরায় পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য এবং দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক সিনিয়র সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (৬৭) আর নেই। ৯ জুন ডিওএইচএস-এর বাসায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে তাকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

অর্থনীতি, বাণিজ্য বিষয়ে তিনি প্রায় ৪০ বছর দৈনিক ইত্তেফাকে সাংবাদিকতা করেন। কয়েক বছর আগে তিনি অবসর নেন। বারিধারার ডিওএইচএস মসজিদে মরহুমের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জে এমডব্লিউ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জানাজা শেষে আদমজি করবস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

শিরিন আবু আকলিহ

ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সেনাদের গুলিতে শিরিন আবু আকলিহ নামে একজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও আলজাজিরার অন্য সাংবাদিকদের বরাত দিয়ে ১১ মে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আবু আকলিহর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। আরেক সাংবাদিক আলি সামুলি আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তারা। তবে ইসরাইলের সেনাবাহিনী তাকে হত্যার খবর অস্বীকার করে বলেছে, পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন তিনি। ২০০০ সাল থেকে আলজাজিরার হয়ে কাজ করছেন শিরিন আবু আকলিহ। তার নিহত হওয়ার খবরে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেয়নি ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

ব্রেন্ট রেনড

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কাছে গুলিতে এক মার্কিন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। কিয়েভ অঞ্চলের পুলিশপ্রধান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওই সাংবাদিকের নাম ব্রেন্ট রেনড (৫২)। ইরপিন শহরের কাছে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে রুশ বাহিনী গুলি ছুড়লে তাতে বিদ্ধ হন তিনি। তার সঙ্গে থাকা আরেক সাংবাদিক আহত হয়েছেন।

ব্রেন্টের কাছে নিউইয়র্ক টাইমসের দেওয়া প্রেস লেখা ছবিসহ পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ব্রেন্ট তাদের সাবেক কর্মী। ইউক্রেনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাকে পাঠানো হয়নি।

কিয়েভ অঞ্চলের পুলিশপ্রধান আন্দ্রেই নেবিতভ বলেছেন, ওই গুলির ঘটনায় ব্রেন্টের সঙ্গে থাকা এক সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহত সাংবাদিকের নাম হুয়ান আরেদন্দো।

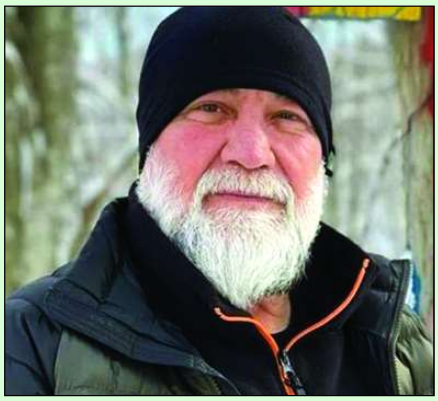

জুনগর আরসলান

তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোঝাইলি প্রদেশে ১৯ ফেব্রুয়ারি নিজের পত্রিকা অফিসের বাইরে এক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তার নাম জুনগর আরসলান। তিনি স্থানীয় দৈনিক সেস কোঝাইলির (কোঝাইলি কণ্ঠ) পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক। গুলিতে গুরুতর আহত অবস্থায় জুনগর আরসলানকে নগরের হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

প্যারিসভিত্তিক গণমাধ্যম অধিকার সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের (আরএসএফ) তুরস্ক প্রতিনিধি এরল ওনদেরগো এএফপিকে জানান, শহরের দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন আরসলান। তিনি এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শনাক্ত করে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়ার আহ্বান জানান।

পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসানের হাতে

পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার-২০২০ প্রদান

পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার-২০২০ পেয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান। কলাম লেখায় অবদান রাখায় তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ১১ এপ্রিল সচিবালয় সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, গুণী সাংবাদিক তৈরি করার ক্ষেত্রে এ ধরনের পুরস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি সৈয়দ বদরুল আহসানকে সুলেখক, সজ্জন এবং নিখাদ ভদ্রলোক হিসাবে আখ্যায়িত করে অভিনন্দন জানান। ১৯৯৯ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য প্রয়াত সাংবাদিক সোহেল সামাদের পরিবার এবং পিআইবিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। এর আগে মন্ত্রী সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসানের হাতে পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার-২০২০-এর সম্মাননা স্মারক, অভিনন্দনপত্র ও চেক তুলে দেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন, পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, পিআইবি-সোহেল সামাদ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। সৈয়দ বদরুল আহসানের সহধর্মিণী সৈয়দা জাকিয়া ও পিআইবি কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণকারী সৈয়দ বদরুল আহসান তার চার দশকের সাংবাদিকতায় এশিয়ান এজ, নিউ নেশন, মর্নিং সান, বাংলাদেশ অবজারভার, ইনডিপেনডেন্ট, নিউজ টুডে এবং ডেইলি স্টার পত্রিকায় কাজের পাশাপাশি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সাউথ এশিয়া মনিটরসহ বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখেছেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল অবধি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ফ্রম রিলে টু ফাউন্ডিং ফাদার: শেখ মুজিবুর রহমান, গ্লোরি অ্যান্ড ডিসপেয়ার; দ্য পলিটিকস অব তাজউদ্দীন আহমদ, দ্য হিস্ট্রি মেকারস ইন আওয়ার টাইমস তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সাল থেকে প্রয়াত সাংবাদিক ও সংবাদ পাঠক সোহেল সামাদ স্মরণে একটি ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে পিআইবি প্রতি দুবছর অন্তর এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। ৫টি ক্ষেত্রে এ পুরস্কার দেওয়া হয়–অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন, প্রেস ফটোগ্রাফি, ফিচার/উপসম্পাদকীয়, গণমাধ্যম ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন ও সাংবাদিকদের কল্যাণমূলক সেবা। সোহেল সামাদের পরিবার এই ট্রাস্টের সিডমানি দাতা।

বেতার-সাংবাদিক সোহেল সামাদ ১৯৫৫ সালের ১০ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। সোহেল সামাদ ছিলেন একাধারে বেতার প্রযোজক, সংবাদ পাঠক, উপস্থাপক, আবৃত্তিকার, সাংবাদিক ও কবি। লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। তিনি ১৯৮৫ সালে যোগ দেন ভয়েস অব আমেরিকায় বেতার সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক ব্রডকাস্টার হিসাবে। ১৯৯৩ সালের ১৩ জুন কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। পরে জানা যায়, তিনি ব্রেন টিউমারে অর্থাৎ দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। ১৯৯৩ সালের ১০ আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসির হায়াটসভিল মানোর নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কুমিল্লা জেলার মুরাগনগর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন

মুরাদনগর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২-৪ জানুয়ারি) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ (আবাসিক) শেষ হয়েছে। ৪ জানুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবদীন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে মুরাদনগর উপজেলার ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ডিএসইসি সদস্যদের জন্য সংবাদ সম্পাদনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের (ডিএসইসি) সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৬-১৮ জানুয়ারি) সংবাদ সম্পাদনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএসইসির সভাপতি মামুন ফরাজী। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ডিএসইসির ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

নোয়াখালীতে পিআইবির চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নোয়াখালী জেলার সাংবাদিকদের জন্য চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১-২৩ জানুয়ারি নোয়াখালী প্রেস ক্লাব এবং নোয়াখালী বিআরডিবি মিলনায়তনে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪-২৬ জানুয়ারি নোয়াখালী প্রেস ক্লাবে টেলিভিশন সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং নোয়াখালী বিআরডিবি মিলনায়তনে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ জানুয়ারি নোয়াখালী বিআরডিবি মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবিএম জাফর উল্যাহ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির প্রশিক্ষক পারভীন সুলতানা রাব্বী। প্রশিক্ষণ চারটিতে নোয়াখালী জেলা এবং বিভিন্ন উপজেলার ১৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৭-১৯ জানুয়ারি) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. নজরুল ইসলাম। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

রাজবাড়ীতে পিআইবির চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে রাজবাড়ী জেলার সাংবাদিকদের জন্য চারটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪-৬ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ জানুয়ারি রাজবাড়ী সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজবাড়ী-১ আসনের সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজবাড়ী পুলিশ সুপার এমএম শাকিলুজ্জামান এবং এডিএম সুবর্ণা রানী সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। এছাড়া ৭-৮ ফেব্রুয়ারি দুইদিনব্যাপী শিশু ও নারী

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

রাজবাড়ী জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন রাজবাড়ী-১ আসনের সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী

উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ৭-৯ ফেব্রুয়ারি তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণও অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ চারটিতে রাজবাড়ী জেলার ১৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সামাজিক মাধ্যমের মিথ্যা তথ্য ও গুজবে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে নাঃ আনিসুল হক

কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনিসুল হক বলেছেন, ফেসবুক, ইউটিউবসহ নানা সামাজিক মাধ্যমের গুজব-মিথ্যা তথ্যে বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক সংবাদ অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি বলেন, নিজেকে গড়তে হলে প্রত্যেক শিশুকে সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। সবাইকে বঙ্গবন্ধুর জীবনী পড়ার আহ্বান জানান তিনি। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে পিআইবি সেমিনার কক্ষে দুইদিনব্যাপী (১২-১৩ ফেব্রুয়ারি) শিশু সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. আনসার আলী। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, শিশুদের জ্ঞানের পরিধি যত প্রসারিত হবে, তাদের দিগন্ত তত বড়ো হবে। শিশুদের জগৎ এখন অনেক বড়ো। দুদিনের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গণমাধ্যম সম্পর্কে যে ধারণা তারা পেল, তা আগামী দিনের চলার পথে সহায়ক হবে। এই জানার দিগন্ত আরও প্রসারিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান।

রাঙ্গুনিয়ায় মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) চট্টগ্রাম ব্যুরোপ্রধান কলিম সরওয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন রাঙ্গুনিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি। প্রশিক্ষণে রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও কাউখালী উপজেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

হাটহাজারীতে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি

শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম রাশেদুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন হাটহাজারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় দুইদিনব্যাপী (২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি) সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউজ ব্রডকাস্টারস অ্যালায়েন্সের সভাপতি মুমতাহিনা হাসনাত রীতু। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে সাংবাদিকতায় আগ্রহী বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পিআইবিতে ৩ মার্চ শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক দিনব্যাপী পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)-এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মো. আনছার আলী। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

বাগেরহাটে মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে বাগেরহাট জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১-৩ মার্চ) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩ মার্চ প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আসাদুল আলম খান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান ছিলেন বাগেরহাট প্রেস ক্লাবের সভাপতি নীহার রঞ্জন সাহা। প্রশিক্ষণে বাগেরহাট জেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বাগেরহাটে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে বাগেরহাট জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৪-৬ মার্চ) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ মার্চ বাগেরহাট প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাগেরহাট জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান প্রধান অতিথি

বাগেরহাট জেলার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য ফ্যাক্টচেক বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ করছেন বার্তা ২৪.কম-এর এডিটর ইন চিফ আলমগীর হোসেন

হিসাবে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান সমাপন অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। বাগেরহাট জেলার ৩৫ জন সাংবাদিক এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে সরকারি ক্রয় নীতিমালাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে সাংবাদিকদের জন্য public procurement rules (সরকারি ক্রয় নীতিমালা) বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন জেলা ও ঢাকার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। ILO-ITC ও CPTU সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ডিআরইউ সদস্যদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২২-২৪ মার্চ) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ মার্চ পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিআরইউ-এর সাবেক সভাপতি এম শফিকুল করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিআরইউ-এর সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ডিআরইউ-এর ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

ডিআরইউ সদস্যদের জন্য ফ্যাক্টচেক বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৭-২৯ মার্চ) ফ্যাক্টচেক বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ মার্চ পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বার্তা ২৪.কম-এর এডিটর ইন চিফ আলমগীর হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিআরইউ-এর সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠু ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ডিআরইউ-এর ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

ফরিদপুরে মোবাইল এবং সিআরসি সিডও মীনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ফরিদপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৭-২৯ মার্চ) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং দুই দিনব্যাপী (২৮-২৯ মার্চ) শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ মার্চ ফরিদপুর সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফরিদপুর জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। বিশেষ অতিথি ফরিদপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। প্রশিক্ষণ দুটিতে ৬৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

লক্ষ্মীপর জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল

পিআইবিতে আদালতবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৯-১১ মে ২০২২) আদালত বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ১১ মে পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. নিজামুল হক নাসিম। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীপুরে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে লক্ষ্মীপর জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১২-১৪ মে) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ মে লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে লক্ষ্মীপুর জেলার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীপুরে মোবাইল এবং শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে লক্ষ্মীপর জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৫-১৭ মে) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং দুইদিনব্যাপী (১৬-১৭ মে) শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ লক্ষ্মীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ মে লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ দুটির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার হোসাইন আকন্দ। বিশেষ অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি হোসাইন আহমদ হেলাল। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। প্রশিক্ষণ দুটিতে লক্ষ্মীপুর জেলার ৬৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহীতে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে রাজশাহীতে জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (২৮-৩০ মে ২০২২) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ মে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল। বিশেষ অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মো. আরিফুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে।

রাজশাহী জেলার সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল